# বসন্ত বিদায়

অবিনাশ সাহা

ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রকাশক
বি. ভট্টাচার্য
৬১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
মণীন্দ্র মিত্র

মুদ্রাকর
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

পাকিস্তানের পরিবেশক
নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬, বাংলা বাজার, ঢাকা

দাম ৩·৫০

বাবার স্মৃতিতে—

লেখকের আরও বই

জয়া

অন্তরাল

প্রাণগঙ্গা

লীলালিপি

ঢাকাই গল্প

পূবের আকাশ

তরঙ্গ ( কাব্য )

নবীন যাত্রী ( নাটক )

## এক

শ্রাবণ সন্ধ্যা। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বিরাট একটা দৈত্যের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে তুন এক্সপ্রেস বেনারস স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। কিছুটা অংশ প্ল্যাটফর্মের ভেতরে, কিছুটা অংশ বাইরে। ভেতরের অংশের যাত্রীরা নামতে না নামতেই প্রতীক্ষারত যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। বাইরের অংশে কোন ভিড় নেই। কেবল মাত্র চার-পাঁচটি যাত্রী গায়ে ওয়াটারপ্রুফ চাপিয়ে কোন রকমে নেমে যায়। কেউ কেউ অসহায়ের মতো কেবলই উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে।

ওয়াটারিং স্টেশন। গাড়ি দশ মিনিট দাঁড়াবে। প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছে, এই দশ মিনিটে যদি বৃষ্টির ধকল কমে আসে।

দেখতে দেখতে জল নেওয়া হয়ে যায়। ইঞ্জিনটা ফোঁস ফোঁস করতে করতে আবার এসে গাড়ির সঙ্গে লাগে। কিন্তু কমার বদলে বৃষ্টির বেগ বেড়েই যায়। মুষলধারেই জল পড়ছে এখন। প্রতীক্ষারত যাত্রীরা নিরুপায়। নারী পুরুষ সকলেই জল মাথায় করে নামতে থাকে।

নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ে। প্ল্যাটফর্মের ভেতরের অংশে ফেরিওয়ালা, কুলি ও কিছু কিছু লোকজন থাকলেও বাইরের দিকটা একেবারেই ফাঁকা। এদিকের গাড়ির ভেতরেও তেমন ভিড় নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় একক একটি যুবক যাচ্ছে। লক্ষ্ণৌ থেকে আসছে সে। বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। বয়েস তেইশ-চব্বিশ—ফর্সা, দোহারা চেহারা। পরনে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি। একটা দেশলাই চাই যুবকটির কিন্তু বৃষ্টির জন্য কোন ফেরিওয়ালাই এদিকে আসছে না। সার্সির ভেতর দিয়ে বাইরের

দিকেই চেয়ে আছে সে। ভাবখানা, যদি ইসারা করে কাউকে ডাকতে পারে।

কাঁটায় কাঁটায় সময় হয়েছে। সবুজ নিশান হাতে করে গার্ড সাহেব স্টেশন মাস্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ওয়াটারপ্রুফ গায়ে নিজের নির্দিষ্ট কামরার কাছে এসে দাঁড়ান। মুখে হুইসল্ পুরেছেন, ফুঁ দেবেন, এমন সময় একই ছাতার নীচে একটি তরুণীকে সঙ্গে করে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোককে ছুটতে দেখা যায়। প্ল্যাটফর্মের দিকে জায়গা না পাওয়ায় বাইরের দিকেই পা বাড়ান ভদ্রলোক। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে যে কামরায় যুবক একা যাচ্ছে তার মধ্যে উঠতেই চেষ্টা করেন। ভদ্রলোকের হাতে কেবলমাত্র একটি এটাচি কেস। মুখ-ভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। পরনে সাদা ধুতি, ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি ও গলায় থোপানো গরদের চাদর। তরুণীটির হাতেও অনুরূপ আর একটি এটাচি কেস ও কাঁধের সঙ্গে লম্বালম্বিভাবে ঝোলানো একটি থার্মোফ্ল্যাস্ক। কালো পাড় সাদা তাঁতের শাড়ি পরনে, গায়ে লাল জেল্লার বুটিদার ব্লাউজ। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ছিপছিপে চেহারা। চোখ মুখ প্রতিভা দীপ্ত। বৃষ্টির ছাটে উভয়ের জামা-কাপড় প্রায় সম্পূর্ণই ভিজে গেছে। শুধু হাতে ছাতা থাকায় মাথা দুটি কোন রকমে রক্ষা পাচ্ছে।

সার্সির ফাঁক দিয়ে যুবক এই দৃশ্য দেখছিল। দেশলাইয়ের আর চাহিদা থাকে না। তাড়াতাড়ি সীট ছেড়ে এসে ভেতর থেকে দরজাটা টেনে ধরে। পাদানীতে ভর করে তরুণীটি আগে ও ছাতা বন্ধ করে ভদ্রলোক পরে গাড়িতে ওঠেন। গার্ড এবার হুইসল্ বাজিয়ে দেন। ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করে। যুবকের ভদ্রতায় মেঝেতে পা দিয়েই ভদ্রলোক তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান, থ্যাঙ্কস্।

যুবক মুখে কোন উত্তর করতে পারে না। মৃদু হেসে প্রতিদান দেয়।

তরুণীটি ইতিমধ্যে কাঁধ থেকে ফ্ল্যাস্কটা ব্রাকেটের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে শাড়ির আঁচল নেংড়াতে থাকে।

ভদ্রলোক এটাচিটা বাঙ্কের ওপর রেখে ভিজে ছাতাটা দরজার একপাশে রাখতে রাখতে তরুণীর আচরণে বাধা দেন, না না, ওতে কোন লাভ হবে না। জামা-কাপড়টা ছেড়েই ফেল, নয়তো অসুখ করবে।

মৃদু হেসে তরুণী জবাব দেয়, আমার দরকার হবে না। হাওয়ায় হাওয়ায় এমনিই শুকিয়ে যাবে'খন। তুমি বরং পালটে নাও।

তরুণীর জবাবে যুবকের চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে ওঠে। হয়তো মুখ খুলতেই যাচ্ছিল সে কিন্তু ভদ্রলোক পুনরায় বাধা দেন, পাগলী কোথাকার, এই স্যাঁতসেঁতে বর্ষায় কেউ কখনো গায়ে ভিজে জামা-কাপড় শুকোয়! শিগগীর বাথরুমে যা।

তরুণী এবার আর অবাধ্য হতে পারে না। এটাচিটা হাতে করে সোজা বাথরুমে চলে যায়। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি।

ভদ্রলোক ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকেন। যুবক বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে খানিক তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। চেনা চেনা মুখ কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারে না। হঠাৎ ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখোচোখি হতে তিনি অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, কি দেখছেন?

যুবক লজ্জা পায়। থতমত খেয়ে ঢোক গিলে উত্তর করে, না—মানে—আপনিও জামা-কাপড়টা তাড়াতাড়ি ছেড়ে ফেলুন স্যার।

হেসে ভদ্রলোক উত্তর করেন, মেনি থ্যাঙ্কস, ও এলেই আমি যাবো।

উভয়েই চুপচাপ। একটু পরেই তরুণী বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। পাটভাঙা আর একখানি আশমানী রঙের শাড়িতে অপূর্ব দেখায় তাকে। ছুঁচের কাজ করা সাদা ব্লাউজটিও সুন্দর মানিয়েছে। প্রভাতের লালিমাই যেন সারা দেহে ঠিকরে পড়ছে। হাসি হাসি

মুখে সীটের কাছে এগিয়ে আসতেই ভদ্রলোক নিজের এটাচিটা হাতে করে বাথরুমের দিকে পা বাড়ান।

শুধু গদির ওপরেই বসতে যাচ্ছিল তরুণীটি, যুবক তাড়াতাড়ি নিজের বালিশের নীচ থেকে একটা সুজনী বার করে অনুরোধ করে, যদি কিছু মনে না করেন, এটা বিছিয়ে দিতে পারি কি ?

হেসে তরুণী জবাব দেয়, কোন দরকার নেই। মিছিমিছি আপনার অসুবিধে করা।

যুবক মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেয়, না না, আমার কোন অসুবিধে হবে না। উনি কিন্তু ঠাণ্ডায় বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন।

তরুণী ঠোঁটের হাসি দীর্ঘায়িত করে সায় দেয়, তবে দিন, আমিই বিছিয়ে নিচ্ছি।

যুবক তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে সুজনীটা ওর হাতে দেয়। উভয়ের মধ্যে চোখোচোখি হয় একবার। তরুণী এক লহমায় দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে ভাঁজ খুলে সুজনীটা বিছোতে যায়। যুবক একপাশ টেনে দিয়ে সাহায্য করে ওকে।

তরুণী না বলতে পারে না। ধন্যবাদ জানাতেও বাধে। যুবকের চোখে মুখেও ফুটে ওঠে লজ্জার ছোপ। বলি বলি করেও আর কিছু বলতে পারে না সে। ভদ্রলোক ততক্ষণে জামা-কাপড় পালটিয়ে বাথরুম থেকে ফিরে আসেন। আপন-ভোলা মানুষ, সুজনীর ওপরে বসেও মনে কোন প্রশ্ন জাগে না। দিব্যি আমেজের সঙ্গে বসে পড়ে স্বস্তির হাঁপ ছাড়েন, অনু, এরপর একপাত্র নিশ্চয় হওয়া উচিত, বলতে বলতে ব্রাকেটের সঙ্গে ঝোলানো ফ্ল্যাস্কটার দিকে কটাক্ষ করেন।

তরুণী সকৌতুকেই জবাব দেয়, তা হতে পারে। কিন্তু মনে থাকে যেন, এখন হলে আর পাবে সেই নামবার সময়।

সে পরের কথা পরে হবে। এখন জলদি কর, ঠাণ্ডায় যে হাত পা সব কাঁপছে, ভদ্রলোক পালটা উৎসাহ দেখান।

তরুণী আর দ্বিরুক্তি না করে সীট থেকে উঠে গিয়ে ফ্ল্যাস্কটা নামিয়ে

নিয়ে আসে। এটাচি খুলে ছোট ছোট দুটো এ্যালুমিনিয়ামের মগ বার করে খানিক ইতস্তত করতে থাকে।

ভদ্রলোক অবস্থা বুঝে আবার তৎপর হন, ভাববার কিছু নেই, ফ্ল্যাস্কের ঢাকনাটাতেও আমার চলবে।

তরুণী অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে বাধা দেয়, উহুঁ, সেটি হবে না। তোমাকে ঢাকনাটা দিলে তুমি কিছুতেই মাত্রা ঠিক রাখবে না। ওটা আমিই নিচ্ছি।

লজ্জা পেয়ে পাশ থেকে যুবক বলে, মাপ করবেন, আমি এই খানিক আগে চা খেয়েছি।

উত্তরে ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করেন, বলছেন কি মশাই! খানিক আগে খেয়েছেন বলে বাদলার দিনে আর এক কাপ চলবে না! আপনি তো দেখছি ওরই দলে!

যুবক কিছু বলার আগে তরুণী সায় দেয়, সবাই আমার দলে হবেন। তোমার মতো তো আর কেউ চা খোর নন!

তরুণীর কথায় ভদ্রলোক কৃত্রিম জ্বলে ওঠেন, হো-য়া-ট! আমি খোর! উইথড্র, উইথড্র দাই ওয়ার্ড প্লিজ!

হেসে তরুণী সমতা রাখে, কি আমি অন্যায় বলেছি যে উইথড্র করবো?

হোয়াট ইউ হ্যাভ নট আটার্ড? এ্যাণ্ড হোয়াট ডু ইউ মিন বাই খোর?—ভদ্রলোক আবার গর্জে ওঠেন।

তরুণী নিজের ঢঙেই জবাব দেয়, তা খোরকে খোর বলবো তাতে হয়েছে কি?

ভদ্রলোক বাধা দেন, বলবে মানে—জুলুমবাজী নাকি?···আচ্ছা, আপনিই বলুন তো মশায়, মদখোর গাঁজাখোর ঘুষখোরের সঙ্গে চা-খোরকে কখনো এক করা যায় কি না!

যুবক বেকায়দায় পড়ে খানিক ইতস্তত করতে থাকে, না, মানে—

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বাধা দেন, বুঝেছি—বুঝেছি, আপনি তো ওঁরই দলে।...

যুবক কোন কিছু বলার আগে তরুণীই অবস্থার মোড় ফেরায়, আচ্ছা হয়েছে, তোমাকে আর ও নিয়ে দরবার করতে হবে না। এই আমি উইথড্র করছি। এখন ধরো তো, বলতে বলতে প্রথম মগ ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে দ্বিতীয় মগ যুবকের দিকে এগিয়ে ধরে।

যুবক বাধা দেয়, ওটা আপনিই নিন। আমি বরং আমার গ্লাস বার করছি, বলতে বলতে সীটের তলা থেকে একটা বেতের ঝুড়ি টেনে বার করে। ফলমূল, খাবারের কৌটো প্রভৃতি অনেক টুকিটাকি জিনিস ঝুড়ির ভেতরে।

তরুণী তার ভেতর থেকে গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ফ্ল্যাস্ক থেকে চা ঢালতে থাকে।

অর্ধেক গ্লাস হতে না হতেই যুবক আবার বাধা দেয়ঃ বাস্ বাস্, হয়েছে। দয়া করে আর ঢালবেন না।

তরুণী আপত্তি জানিয়ে বলে, এক কাপও যে হলো না।

হেসে যুবক বলে, তা না হোক, ওতেই আমার যথেষ্ট।

তরুণী মুখে আর কোন উত্তর না দিয়ে চা সমেত গ্লাসটা যুবকের হাতে দিয়ে ফ্ল্যাস্কের মুখটা বন্ধ করতে যায়।

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি করে কয়েক ঢোক গিলে নিয়ে নিজের পাত্রটা এগিয়ে ধরেন।

হাসতে হাসতেই তরুণী আপত্তি জানায়, উঁহু, বলেছি তো, আর সেই নামবার সময়।

ভদ্রলোক কৃত্রিম হতাশায় ফেটে পড়েন, বড় বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস! যে চায় সে পায় না, যে পায় সে খায় না।

তরুণী সমতা রেখেই জবাব দেয়, তোমার চেয়েও কাজ নেই পেয়েও কাজ নেই।

ভদ্রলোক আর এক ঢোক গিলে নিয়ে হাঁপ ছাড়েন, অগত্যা!
কিন্তু জানেন মিস্টার,—যুবকের দিকে চোখ ফিরিয়ে কি যেন বলতে
যাচ্ছিলেন।

যুবক এতক্ষণ সঙ্কোচের সঙ্গে অপেক্ষা করছিল। সুযোগ বুঝে
ঘনিষ্ঠ হতে যায়, আমার নাম শ্রীপ্রশান্তকুমার সেন।

কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেন ভদ্রলোক। খুশীতে লাফিয়ে ওঠেন,
কি বললেন, আপনি সেন! মানে বৈদ্য!

প্রশান্ত ঘাড় নাড়ে, আজ্ঞে হ্যাঁ!

সোৎসাহে ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করেন, কোথায় নিবাস বলুন
তো?

প্রশান্ত উত্তর করে, সেনহাটি।

সেনহাটি! তবে তো মশায় মস্ত বড় কুলীন আপনি! আমার
মামাবাড়ি ওখানে, গর্বে প্রসন্ন হয়ে ওঠে ভদ্রলোকের মুখাবয়ব।

প্রশান্তও মনে মনে গর্ব অনুভব করে। উৎসাহিত হয়ে সেও
জানতে চায়, আপনার নামটা জানতে পারি কি স্যার?

হাসতে হাসতেই ভদ্রলোক বলেন, বিলক্ষণ, তবে আমার নাম
জেনে আর কি হবে? সামান্য একজন গরীব শিক্ষক আমি—শ্রী
বিশ্বপতি দাশগুপ্ত।

প্রশান্ত কেমন যেন খটকায় পড়ে। বিস্ময়ের সঙ্গে মনে মনে
বারকয়েক নামটা আওড়িয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে, আপনি কখনো
প্রেসিডেন্সী কলেজে ছিলেন কি স্যার?

ছিলাম, পাঁচ বছর। নাইন্‌টিন ফরটি থেকে ফরটি ফোর
পর্যন্ত। কিন্তু কেন বলুন তো?—বিস্মিতভাবে পালটা প্রশ্ন করেন
বিশ্বপতি।

প্রশান্ত নিঃসংশয়ে উচ্ছ্বাস জানায়, ডক্টর দাশগুপ্ত! আমাকে মাপ
করবেন স্যার। এতক্ষণ আমি আপনাকে চিনতে পারি নি, বলতে
বলতে উপুড় হয়ে পায়ের ধুলো নিতে যায়।

বিশ্বপতি হতবাক্ হয়ে প্রশান্তর হাত চেপে ধরে পালটা উচ্ছ্বাস জানান, সে আর এমন কি আশ্চর্যের কথা! চেনবার মতো বড় বস্তুটিই যে চাপা পড়ে আছে, হাসতে হাসতে দাড়ি সরিয়ে থুতনীর তলার বড় আঁচিলটার ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রশান্ত ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে শুধোয়, আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না স্যার!

এবার সত্যি সত্যি ফাঁপরে পড়েন ডক্টর দাশগুপ্ত। চায়ের মগটা নামিয়ে রাখতে রাখতে খানিক ইতস্তত করতে থাকেন, না—মানে—

হেসে প্রশান্ত বলে, বুঝেছি, আমি আপনার ছাত্র স্যার—অক্ষয়বাবুর ভাগনে।

ডক্টর দাশগুপ্ত এবার লাফিয়ে ওঠেন, আই সি, তাই বলো! অক্ষয়ের ভাগনে...মানে...তুমি বাবলু।

প্রশান্ত ঘাড় নাড়ে, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

তা হলে আর তোমাকে চিনতে পারবো না কেন হে! তুমি তো বরাবর ইতিহাসের ফার্স্ট-বয় ছিলে। তা বাবলু থেকে এখন আবার প্রশান্ত বনে গেলে কি করে অন্ত পাই বলো?—হোহো করে হাসতে থাকেন ডক্টর দাশগুপ্ত।

উত্তরে প্রশান্ত শুধু মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে।

তরুণীও এতক্ষণ অবাক্ হয়েই উভয়ের কথাবার্তা গিলছিল। ডক্টর দাশগুপ্তর রসিকতায় ওর পাপড়ি ঠোঁটেও হাসি খেলে এবার।

ডক্টর দাশগুপ্ত হাসি থামিয়ে আর এক ডিগ্রি মাত্রা চড়ান, তুমি লজ্জা পেলে নাকি হে বাবলু। বেশ, এবার থেকে না হয় সাগর সম্রাট বলেই ডাকা যাবে। তা তোমার অক্ষয়মামা এখন কি করছেন?

মেজমামা এখন রেঙ্গুনে প্র্যাকটিস করছেন, প্রশান্ত হেসে হেসেই জবাব দেয়।

একেবারে মগের মুলুকে! কেন হে এ দেশের কোন কোর্টে বোধ হয় ব্রিফ্ জুটলো না?—দু'চোখ বিস্ফারিত করেন ডক্টর দাশগুপ্ত।

না স্যার, ক্যালকাটা হাইকোর্টে উনি খুবই পপুলার হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ওঁর এক বর্মি বন্ধু কি একটা বড় মামলায় ধরে নিয়ে যান ওঁকে। প্রায় দু'বছর সেখানেই আছেন। খুব বিনয়ের সঙ্গেই উত্তর করে প্রশান্ত।

উত্তরে ডক্টর দাশগুপ্ত স্বস্তির হাঁপ ছাড়েন, তা ভাল, বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক সিঁড়ি এগিয়ে যাওয়া। তা তুমি এখন কি করছো?

প্রশান্ত এবার একটু লজ্জায়ই পড়ে। সংকোচের সঙ্গেই জবাব দেয়, আমি লক্ষ্ণৌতে আছি স্যার। এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব্ পোষ্ট অফিসেস্।

ডক্টর দাশগুপ্তর কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে, আমি এর চেয়ে অনেক বেশী আশা করেছিলাম তোমার কাছে।

প্রশান্ত মাথা নীচু করেই বলতে থাকে, আমিও অনেক কিছু স্বপ্ন দেখেছিলাম স্যার। কিন্তু বাবা কিছুতেই ছাড়লেন না। রিটায়ার্ড হবার আগেই উনি অনেক ধরে করে···

প্রশান্তর কথা শেষ না হতেই ডক্টর দাশগুপ্ত বাধা দেন, তা তোমার বাবা কিছু অন্যায় করেছেন বলছিনে। কেননা, লেখাপড়া শিখেও যখন মানুষ পেটের ভাত নিয়ে নিশ্চিন্ত নয় তখন প্রত্যেক অভিভাবকের পক্ষেই শঙ্কা থাকা স্বাভাবিক। যা হোক, এখন চলেছ কোথায়?

আজ্ঞে, কলকাতা যাবো, মাথা নীচু করেই উত্তর করে প্রশান্ত।

মাই গড্! অনু, তা হলে আর তোমাকে গাড়ি বদলাতে হচ্ছে না, প্রশান্তকে সঙ্গী পাচ্ছ। বাই দি বাই, তোমাদের দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। অনু, প্রশান্তর পরিচয় তো তুমি পেলেই। আমার ছাত্র, ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি, এ পাস করেছে। আর প্রশান্ত, অনিতা হলো আমার দাদার একমাত্র মেয়ে। তোমার মতো ইতিহাসে অনার্স নিয়েই এবার ও বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে বি, এ দিচ্ছে। যাবে বর্ধমান—মামাবাড়ি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে,

আমার আবার পাটনা ইউনিভার্সিটিতে একটা লেকচার আছে, নেমে যেতে হবে।

নমস্কার বিনিময় করে প্রশান্ত বলে, উনি যদি লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে যেতে চান তাতেও কোন অসুবিধা হবে না স্যার। আমি মাঝে মাঝে নেমে খোঁজ নিতে পারবো।

লজ্জায় অনিতার চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। প্রশান্তর দিকে এক ঝলক দৃষ্টিক্ষেপ করে ডক্টর দাশগুপ্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ডক্টর দাশগুপ্ত ওর মনোভাব বুঝেই উত্তর করেন, আরে, না হে না, তুমি অত সঙ্কোচ করছ কেন? অতটা সাইনেস অনুর মধ্যে নেই।

অনিতার মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রশান্ত কথা ঘুরিয়ে নেয়ঃ আমি ঠিক তা বলছিনে স্যার। রিজার্ভেসন যখন নেই তখন এখানে ঘুমোবার সুযোগ হয়তো না-ও হতে পারে।

ডক্টর গুপ্ত বাধা দেন, এক রাত না ঘুমোলে কিছু এসে যাবে না। পরীক্ষার সময় কত রাত জাগতে হয়েছে মনে নেই! অনু, তোমার সাবজেক্ট নিয়ে প্রশান্তর সঙ্গে আলোচনা করলে তুমি উপকৃতই হবে।

প্রশান্ত লজ্জা পায়। বলে, কি যে বলেন স্যার। কবে ছেড়ে দিয়েছি, এখন কি আর কিছু মনে আছে?

মনে না হয় অনুই করিয়ে দেবে, ডক্টর দাশগুপ্ত হালকাভাবেই জবাব দেন।

প্রশান্ত কিছু বলার আগে অনিতা মুখ খোলে, যাও, তুমি ভারি লজ্জা দিতে পারো।

ডক্টর দাশগুপ্ত স্বকীয়তা রেখেই বলেন, লজ্জায় পড়তে হয় সে পরে পড়ো, এখন কিন্তু আর এক পাত্র না হলে দম রাখতে পারছিনে।

উঁ-হু, সেটি আর হচ্ছে না। —অনিতা মাথা নেড়ে জবাব দেয়।

অনিতাকে সমর্থন করে প্রশান্ত বলে, এত ঘন ঘন চা পান করা কিন্তু খুব ভাল নয় স্যার।

দেখ বাবলু, আই অ্যাম সরি—মিস্টার মহাসাগর। চা পান করাকে তোমরা যতটা খারাপ মনে করছো, আমার মনে হয় আসলে ওটা তত খারাপ নয়—ডক্টর দাশগুপ্ত কথা শেষ করতে পারেন না।

অনিতা বাধা দেয়, তুমি যতই বলো, লেজ কাটতে আমরা কেউ রাজী নই।

না না, লেজ আমি তোমাদের কাকেও কাটতে বলছিনে। আসল কথাটা কি জানো, কোন বিজ্ঞানী যদি ভালভাবে এ নিয়ে গবেষণা করতেন, তা হলে আমি জোর করে বলতে পারি, চা পানে অপকারিতার চেয়ে উপকারিতাই প্রমাণিত হতো।—ডক্টর দাশগুপ্ত এক দমে আরও অনেক কিছু বলতে যান। কিন্তু পারেন না।

অনিতা আবার বাধা দেয়, আচ্ছা হয়েছে, ইতিহাসের অধ্যাপকের কাছে আমরা রসায়ন শাস্ত্রের লেকচার শুনতে চাইনে। চুপ করে বসো, আমি বাথরুম থেকে মগ দুটো ধুয়ে নিয়ে আসি। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রশান্তর দিকে হাত বাড়ায়। বলে, মিস্টার সেন, আপনার গ্লাসটা দিন।

প্রশান্ত সলজ্জভাবে বাধা দেয়, না না, ওকি বলছেন। আমিই যাচ্ছি।

অনিতা কিছু বলার আগে ডক্টর দাশগুপ্ত সায় দেয়, গ্লাসটা দাও-ই না হে মহাসাগর! কাজ করা ওর অভ্যাস আছে!

না স্যার, এ ভারি অন্যায় হবে। প্রশান্ত সক্রিয় হতে পারে না।

অনিতা একরকম জোর করেই গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে উত্তর দেয়, কিছুই অন্যায় হবে না।

ডক্টর দাশগুপ্ত ওকে সমর্থন করে বলেন, ঠিক বলেছে, এটা ওর ডিউটি।

অনিতা আর না দাঁড়িয়ে গ্লাস ও মগ দুটো নিয়ে বাথরুমে চলে যায়।

একা পেয়ে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে, এখন কোথায় আছেন স্যার?

ডক্টর দাশগুপ্ত বিস্মিতভাবে জবাব দেন, ঐ যা, কথায় কথায় আসল কথাটাই তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।—বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে।

প্রশান্ত বলে, এত কাছাকাছি আছি স্যার, তবু দেখা-সাক্ষাৎ নেই। মাঝে দু'বার বেনারস এসেওছিলাম, জানতে পারলে নিশ্চয় দেখা করতুম।

বেশ তো, এবার একদিন এসো না, সব দেখেশুনে যাবে। বেনারসে তো দুটো জিনিসই আছে। এক বাবা বিশ্বনাথ আর ইউনিভার্সিটি। তা একবার এসো না, ডক্টর দাশগুপ্ত প্রাণ খুলেই আহ্বান জানান প্রশান্তকে।

উত্তরে প্রশান্ত বলে, বছরে অবশ্য দু'একবার আসতে হয় বেনারসে। এবার এলে নিশ্চয় দেখা করবো স্যার।

এলে কি হে! ফেরবার পথেই একদিন নেমে দেখে যাও না।

চেষ্টা করবো স্যার।

প্রশান্তর কথা শেষ হতে না হতেই অনিতা ফিরে আসে। মগ দুটো ব্রাকেটের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে ভিজে জামা-কাপড়গুলো মেলে দিতে থাকে। বাঙ্কের শিকলের সঙ্গে শাড়ি এবং ধুতির এক মাথা বেঁধে আর-এক মাথা কোথায় বাঁধবে ইতস্তত করতে থাকে। প্রশান্ত ওদিক থেকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়। বলে, আমাকে দিন। আমি এদিকের শিকলের সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছি।

অনিতা না বলতে পারে না। সঙ্কোচ হলেও মুখটিপে হাসতে হাসতে ওর দিকেই এগিয়ে দেয়।

শাড়ি এবং ধুতির এদিকের আঁচল দুটো বেশ উঁচু করেই শিকলের সঙ্গে বেঁধে দেয় প্রশান্ত। বাতাসে ফরফর করে উড়তে থাকে। বৃষ্টি এখন নেই বললেই হয়। সামান্য গুড়িগুড়ি পড়ছে। জানালাগুলো খোলাই আছে। কাজ সেরে অনিতা আবার এসে ডক্টর দাশগুপ্তর পাশে বসে।

ডক্টর দাশগুপ্ত এতক্ষণ ওদের দু'জনের কাজ দেখছিলেন। হয়তো কিছু ভাবছিলেনও। অনিতা পাশে এসে বসতেই আবার মামুলী কথায় ফিরে যান, তা'হলে কি সত্যি-আর এক পাত্র হবে না অনু ?

অনিতা হালকাভাবেই জবাব দেয়, বলেছি তো, ভদ্রলোকের এক কথা।

তা হলে কিন্তু শুয়ে পড়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।

অনিতা বলে, বেশ তো, একটু ঘুমিয়েই নাও না। শেষ রাত্রে নামতে হবে, ঘুমোবার আর সময় পাবে না—।

বেশ, ভাল কথা। প্রশান্ত, আমাকে কিন্তু সত্যি মাপ করতে হবে।

সেই ভাল স্যার, একটু ঘুমিয়েই নিন, প্রশান্ত অনিতাকে সমর্থন করেই জবাব দেয়।

ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, বেশ, তবে তাই হোক। অনু, আরম্ভ কর তা হলে।

ধেৎ, অনিতা লজ্জায় ঝংকার দিয়ে ওঠে।

ধেৎ মানে! চা-ও দেবে না, আবার ঘুমোতেও দেবে না, সে কি রকম ?

কেন, ঘুমোতে কি আমি বারণ করছি ?—অনিতা দৃঢ় থেকেই জবাব দেয়।

ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, বারণ নয়তো কি ? তোর গান না শুনে কখনো আমি ঘুমোই ?

গাড়িতে গান গাইলে লোকে পাগল বলবে, অনিতা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

বিস্ময়ের সুরে ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, লোক আবার এখানে কে ? প্রশান্তর দিকে দৃষ্টি প্রতিফলিত করেন, আচ্ছা প্রশান্ত, গান শুনতে তোমার কোন আপত্তি আছে ?

প্রশান্ত মুখ টিপে টিপে হাসছিল। ডক্টর দাশগুপ্তের প্রশ্নে সোৎসাহে জবাব দেয়, কিছুমাত্র না স্যার। এমন বাদলার দিনে কে না গান শুনতে চাইবে?

আমি জানি তোমার কোন আপত্তি হবে না। অনু, আর আপত্তি করা চলবে না। প্রশান্তও গান শুনতে ভালবাসে, কৌতুকের হাসি হাসতে থাকেন ডক্টর দাশগুপ্ত।

অনিতা সেদিকে কান না দিয়ে পাশ কাটাতে চায়, কিন্তু গলাটা যে ঠাণ্ডায় ধরে আছে।

ডক্টর দাশগুপ্ত লাফিয়ে ওঠেন, তাইতো বলছিলাম, আর এক রাউণ্ড হোক।

উঁহু, সেটি হচ্ছে না। তুমি শোও, আমি না হয় চেষ্টা করে দেখছি।

ডক্টর দাশগুপ্ত গা এলিয়ে দেন, অনিতা তন্ময় হয়ে গাইতে থাকে—কবিগুরুর গান।

গাড়ি দ্রুত ছুটে চলেছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হতে থাকে। গানও থেমে যায় এক সময়। ডক্টর দাশগুপ্ত ঘুমিয়েই পড়েছেন। কোন রকম সাড়াশব্দ নেই। সুরের মূর্ছনায় প্রশান্তও অনড়—অচল। চোখ বুজে হয়তো দিবা রাত্রির স্বপ্নই দেখছে সে। ঘুম নেই কেবল অনিতার চোখে। দৈত্যের পিঠে চড়ে রূপকথার রাজ্যেই যেন ভেসে চলেছে ও। দেয়ালে হেলান দিয়ে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। শ্রাবণের বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। বেশ মুষলধারেই পড়ছে। বড় ভাল লাগে অনিতার। মিস্টার সেন কি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন? জেগে থাকলে দু'জনে বেশ গল্প করা যেতো, মনে মনেই ভাবে অনিতা। পাশ ফিরে তাকায় একবার প্রশান্তর দিকে।

ঘুম প্রশান্তরও আসে নি। ডক্টর দাশগুপ্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। লজ্জায় ও চোখ মেলতে পারছে না। সহসা একবার চোখোচোখি

হয়ে যায়। একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয় অনিতা। প্রশান্তও চোখ বোজে। খানিক পরে আবার চোখোচোখি হয়। কিন্তু কথা আর হয় না। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে গাড়ি শেষ রাত্রে পাটনা জংশনে এসে দাঁড়ায়। অনিতা ডক্টর দাশগুপ্তর গায়ে টোকা দিয়ে ডাকতে থাকে, কাকামণি—কাকামণি, ওঠো।

ডক্টর দাশগুপ্ত ধড়ফড় করে উঠে বসেন। দু'চোখে ঘুম জড়ানো।

প্রশান্তর চোখে ঘুম ছিল না। সেও উঠে বসে।

এটাচি কেসটা হাতে নিয়ে নেমে যেতে যেতে ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, প্রশান্ত চলি। পৌঁছে সংবাদ দিয়ো। ফেরবার পথে আসছো কিন্তু।

চেষ্টা করবো স্যার, হাতজোড় করে নমস্কার জানায় প্রশান্ত।

অনিতা উঠে দোর পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

গাড়ি ধীরে ধীরে আবার চলতে থাকে। প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে গেলেও সীটে ফিরে আসে না অনিতা। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বৃষ্টির লেশমাত্র নেই। মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। জানালায় ঝুঁকে পড়ে বাইরের দিকেই তাকিয়ে থাকে। প্রশান্ত অস্বস্তি বোধ করে। ডক্টর দাশগুপ্ত এতক্ষণ ছিলেন কোন সঙ্কোচই ছিল না। এখন যেন কেমন বাধো বাধো ঠেকছে। অনিতারও মুখ ফেরাতে লজ্জা করছে।

বারকয়েক ঘর্‌বা'র করে শেষ পর্যন্ত ভেতর-মুখো হয়েই বসে প্রশান্ত। ও জানে, মুখ প্রথমে ওকেই খুলতে হবে।

গাড়ি ইতিমধ্যে ঝড়ের বেগে ছুটতে শুরু করেছে। হঠাৎ মাথায় আসে প্রশান্তর, থিতিয়ে থিতিয়েই বলতে থাকে, বাইরের দিকে মুখ রাখলে চোখে কয়লার কুচি যেতে পারে।

প্রশান্তর নৈর্ব্যক্তিক উক্তিতে হাসিই পায় অনিতার। বলে, আমরা অনেকটা পেছনের দিকে বসেছি, সে ভয় নেই, একঝলক মুখ ঘুরিয়ে আবার বাইরের দিকেই মুখ রাখে অনিতা।

প্রশান্তর সাহস বেড়ে যায়। পালটা জবাবে সোজসুজিই বলে, ভয় খুব আছে, সীটে এসে বসুন।

খুব গার্জেনগিরি শুরু করলেন যে, ঠোঁটে হাসি টেনে সীটেই ফিরে আসে অনিতা।

হেসে প্রশান্ত বলে, না, গার্জেনগিরি করবার মতো দুঃসাহস আমার নেই। তবে চোখে কয়লার কুচি গেলে আমাকেই আবার দেখতে হবে এই যা।

কথার মোড় ঘুরিয়ে অনিতা বলে, বেশ তো, গার্জেনগিরিতে যদি আপত্তি থাকে তাহলে মাস্টারিই শুরু করুন না।

প্রশান্ত আঁতকে ওঠে, ওরে বাপরে, ওতো আরও শক্ত ব্যাপার।

কাকাবাবুর কিন্তু সেই নির্দেশই আছে, অনিতা জবাব দেয়।

খানিক ইতস্তত করে প্রশান্ত বলে, না—মানে মাস্টার মশায়কে আমি ফাঁকি দিতে চাইনে। তবে কি জানেন, ইতিহাস হচ্ছে মানুষের সাংস্কৃতিক মনের যুগ-যুগান্তের দলিল। যার শেষ নেই—সীমান্ত নেই। সামান্য এই সময়টুকু বস্তাপচা ওই অতীত নিয়ে না কাটিয়ে বর্তমানের সদ্ব্যবহার করাই ভাল নয় কি?

বিস্ময়ের সঙ্গে অনিতা বলে, সেটা আবার কি বস্তু!

প্রশান্ত বলে, গাড়ি চলেছে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। একদিন জীবনের গতিও এমনি করেই ফুরিয়ে যাবে। তাই বলছিলাম কি, এই ক্ষণমুহূর্তের ইতিহাসটুকু জীবনের খাতায় অক্ষয় করে লেখা যায় না কি?

হাসতে হাসতে অনিতা বলে, বড্ড বেশী দর্শন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

প্রশান্ত জবাব দেয়, দর্শন আর হলো কই? কবি বলেছেন—

প্রশান্তর মুখের কথা শেষ হতে পারে না। অনিতা বাধা দেয়, এসময়ে কবিতা! ঘুম হবে না যে। তার চেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ুন।

শোব না, গান শুনবো, কথার মোড় ঘুরিয়ে সোজাসুজি আব্দার জানায় প্রশান্ত।

অনিতা বলে, শান্তিভঙ্গের অভিযোগে পাশের কামরা থেকে এক্ষুনি তাহলে লোকে শিকল টানবে।

গাড়ির শব্দে যদি শান্তিভঙ্গ না হয় তাহলে গানে কখনো তা হবে না। আসলে আপনি গাইবেন না তাই বলুন, প্রশান্তর কণ্ঠে অভিমান ঝরে পড়ে।

একটু দম নিয়ে অনিতা বলে, অমনি রাগ হলো তো?

প্রশান্ত কোন উত্তর করে না। গোঁজ হয়েই বসে থাকে।

হেসে অনিতা বলে, বাব্বা, আচ্ছা গার্জেনের পাল্লায় পড়েছি। রাগ করতে হবে না, এই আমি গাইছি। কিন্তু কোন লোক তেড়ে আসলে আপনি বুঝবেন।

সে দেখা যাবে, হাতের পেশী দৃঢ় করে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে প্রশান্ত।

অনিতা গাইতে থাকে—রবীন্দ্রনাথের গান।

গান শেষ হয়ে যায়। অনিতা উদাসিনীর মতোই বসে থাকে। পাশের সীটে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে প্রশান্ত। আর কোন কথা হয় না উভয়ের মধ্যে। গাড়ি দ্রুত চলতে চলতে ভোর ভোর এসে বর্ধমান পৌঁছোয়। প্রশান্তর দেওয়া সুজনীটা ভাঁজ করতে করতে অনিতা বলে, চলি মিস্টার সেন। আবার নিশ্চয় দেখা হচ্ছে?

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে প্রশান্ত সম্মতি জানায়, নিশ্চয়।

চলি তা হ'লে, নমস্কার।—হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে এটাচি কেস হাতে নেমে যায় অনিতা।

প্রশান্তও হাত জোড় করেই প্রতিদান দেয়।

গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ দৃষ্টি যায়—পরস্পর চেয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। গাড়ি মোড় ঘুরলে ভেতরে মুখ ফিরিয়ে আঁতকে ওঠে প্রশান্ত। মেলে দেওয়া শাড়ি, ধুতি জামা সবগুলোই যে ওঁরা দু'জনে মনের ভুলে ফেলে গেলেন! কিন্তু আর কোন উপায় নেই। একে একে সবগুলোই ভাঁজ করে নিজের ট্রাঙ্কে

রাখে। ফেরার পথে দিয়ে যাবে। আর নয়তো পার্শেল করে পাঠিয়ে দেবে।

## দুই

পরের দিন কলকাতা। রাত আনুমানিক দশটা। গুমট গরম। প্রশান্ত রাতের আহার শেষ করে দোতলার গাড়ি বারান্দার ওপর একখানি ডেক-চেয়ারে এসে বসে। বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ওকে। সামনের পার্ক আজ প্রায় জনবিরল। টিপ-টিপ করে গ্যাসের বাতি জ্বলছে। বিলেতি পামগাছগুলো সারবন্দীভাবে দাঁড়িয়ে। কোন রকম আলোড়ন নেই। জন-দুই ফেরিওয়ালা অনেকক্ষণ বিফল চেষ্টার পর চলে গেল। প্রবেশ পথের পকুড়িওয়ালা পকুড়ি ভাজা বন্ধ করে দিয়েছে। ভাজা পকুড়িগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই উঠে যাবে সে। পার্কের অধিকাংশ বেঞ্চই ফাঁকা। মাত্র গোটা কয়েকের ওপর জনকয়েক বসে জটলা করছে। নীচুতলার লোকই হবে ওরা। পরনে ময়লা জামা-কাপড়। সহসা গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হওয়ায় যে যার মতো দৌড়োতে থাকে। পকুড়িওয়ালাও জ্বলন্ত উনুন আর ঝুড়ি নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে গিয়ে সামনের গাড়ি বারান্দার নীচে আশ্রয় নেয়। কিন্তু বৃষ্টি তেমন জোরে নামে না। খানিক পরেই একবারে বন্ধ হয়ে যায়। পার্কে আর কোন লোকজন ফিরে আসে না। ধীরে ধীরে সমস্ত পল্লীই নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দু'একখানা রিক্শার টুংটাং শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দ নেই। মেঘ-চাপা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় দিকচক্রে ভোরের ছাপ। প্রশান্তর মনেই হয় না ওকে ঘুমোতে হবে। গতরাত্রে একবিন্দু ঘুম হয় নি। কিন্তু আজও কোন রকম ক্লান্তি নেই। থেকে থেকে কেবলই মনে পড়ছে, গাড়ির কথা। পাশাপাশি চলেছে ওরা দু'জনে। ও আর অনিতা। বড় সুন্দর

মেয়েটি। অনুক্ষণ হাসি লেগে আছে ঠোঁটের কোণে। অদ্ভুত গান গায়। অনিতার শেষের গানটি অজান্তেই মানসপটে অনুরণিত হতে থাকে। তন্ময় হয়ে বসে থাকে প্রশান্ত। পার্কের অপর প্রান্তে বসে কে যেন গিটার বাজাচ্ছে। শ্রাবণের মৌনতা ভেঙে ভেসে আসছে সুরেলা সুর-ঝংকার। স্বপ্ন-মায়ায় ডুবে যায় প্রশান্ত।

একটু পরে একখানি রেকাবিতে করে দু'খিলি পান ও কিছু মসলা নিয়ে মীনা এসে দাঁড়ায়। প্রশান্তর মৌনতায় হাসিই পায় ওর। ডাকতে গিয়েও ডাকে না, চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকে। কি ভাবছে প্রশান্তদা? নিশ্চয় বৌদির কথা। কাল বাদে পরশু গায়েহলুদ। ছোটবেলার খেলার সাথী সুচরিতা। আট-দশ বছর পর্যন্ত উভয়ে এক সঙ্গে খেলেছে, ঝগড়া করেছে, গলা জড়িয়ে ধরে ভাব করেছে। তারপর আট-দশ বছর আর দেখা নেই। বাল্যের সেই খেলার সাথীই আজ জীবনসঙ্গিনী হয়ে ঘরে আসছে। ভাবনা স্বাভাবিক। মীনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজাই দেখতে থাকে। মৃদু হাসি খেলে ঠোঁটের কোণে। খানিক অপেক্ষা করে পেছন থেকেই আব্দার জানায় মীনা, পান নাও রাঙাদা।

ডাক শুনে প্রশান্ত চমকে ওঠে। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলে, পান খাওয়া তো অভ্যাস নেইরে। আচ্ছা, তুই যখন এনেছিস দে।

এখন থেকে একটু অভ্যাস করো। নয়তো বৌদি আবার পছন্দ করবেন না।—মীনার ওষ্ঠে বাঁকা হাসি।

পালটা জবাবে প্রশান্ত বলে, না, করবে না। তোর মতো গেঁয়ো কিনা যে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করবে!

খুব হয়েছে মশায়, আপনার বৌ না হয় লিপষ্টিক দিয়েই মেম সাহেব সাজবেন, হলো তো? এখন দয়া করে নিন তো? রেকাবিটা এগিয়ে ধরে মীনা।

প্রশান্ত হাত বাড়িয়ে একটা খিলি তুলে নিতে নিতে বলে, আচ্ছা, তোকে আর ফাজলামো করতে হবে না। খেয়ে নি গে যা।

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মীনা টিপ্পনী কাটে, আর তুমি? একা একা চাঁদের দিকে মুখ করে প্রেয়সীর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করো —কেমন?

খুব ফাজিল হয়েছিস তো? প্রশান্ত আর কিছু বলার আগে নেপথ্যে থেকে সারদা দেবী হাঁক ছাড়েন, ওরে মিনু, খাবার দেওয়া হয়েছে, শীগ্‌গির আয়।

প্রশান্ত সে কথার সূত্র ধরে আবার তাড়া দেয়, কইরে, দাঁড়িয়ে রইলি যে। রাত কম হলো না, বড় মা আর কতক্ষণ বসে থাকবেন?

বড় মা মানে মীনার মা সারদা দেবী। প্রশান্তর বিয়ে উপলক্ষে দিনকয়েক হলো এসেছেন।—এক সময় মীনার বাবা গৌরহরিবাবুর সঙ্গে প্রশান্তর বাবা আদিনাথবাবু ভাগলপুর পোস্ট অফিসে একত্র কাজ করতেন। বয়সে গৌরহরি কিঞ্চিৎ বড় হলেও উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সন্তান-সন্ততির মধ্যে এ-পক্ষে একা মীনা ও ও-পক্ষে একা প্রশান্ত। কোন পক্ষেরই আর কোন সন্তান লাভের সম্ভাবনা না থাকায় প্রশান্ত যেমন সারদার কাছে পেটের ছেলের মতোই আদর পেতে থাকে মীনাও তেমন প্রশান্তর মা উমা দেবীর কাছে মেয়ের মতো আদর পায়। পরস্পর পিঠোপিঠি ভাই বোনের মতোই মানুষ হতে থাকে মীনা আর প্রশান্ত। তাই প্রশান্তর বিয়ে—মীনার আপন দাদারই বিয়ে। মায়ের ডাকে 'যাই' বলে সাড়া দিয়ে মীনা আবার টিপ্পনী কাটে, বেশ, আমি যাচ্ছি, তুমি একা একা বসে যতক্ষণ পারো দেবীর ধ্যান করো, তু'পা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় মীনা।

প্রশান্ত পেছু ডাকে, মীনু শোন?

মীনা ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার আদিখ্যেতা শুনবার মতো সময় আমার নেই।

মীনা তু'পা এগিয়ে এলে প্রশান্ত শুধোয়, হ্যাঁরে, রথীন এল না যে?

পোস্ট অফিসের কেরানীদের বুঝি আবার ছুটি আছে ?—বাঁকা হাসি হেসেই উত্তর দেয় মীনা।

উঃ! তোর মুখে যে কিছুই আটকাচ্ছে না? খুব লায়েক হয়েছিস তো?

তোমার চেয়েও!

ফাজলামো রাখ, সত্যি বল, রথীন এল না কেন?

ঐতো বললুম, বিয়ের দিন পৌঁছুবেন। অনেক চেষ্টা করে মাত্র সাত দিনের ছুটি পেয়েছেন।

যাক বাঁচালি! আমি তো ভেবেছিলাম, উৎসবে সবার মুখে হাসি ফুটলেও মীনারাণী গুমরে মরবে।

তাই তো একটা রাতও সবুর সইছে না, হাঁপিয়ে উঠেছ। বেশ, যত পারো বসে বসে ভাবো, আমি চললাম, মীনা একদমে কথাগুলো বলে সিঁড়ির দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দেয়।

প্রশান্ত ওর চলার পথ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চাঁদের দিকে মুখ করে বসে থাকে। একের পর এক গতরাত্রের প্রতিচ্ছবিই চোখের ওপর ভেসে চলে।

নিশুতি রাত। সমস্ত বাড়ি নিঝুম নিস্তব্ধ। প্রশান্ত দোতলার ঘরে একক একটি খাটের ওপর শুয়ে। আকাশে মেঘ নেই। বেশ পরিষ্কার হয়েই চাঁদ উঠেছে। খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক জ্যোৎস্না বিছানার ওপর এসে পড়েছে। ঘরে বেশী কোন আসবাব-পত্র নেই। এক কোণে ছোট একটা টেবিলের ওপর টাইমপিস্‌টা টিকটিক শব্দে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। চারদিকের দেওয়ালে জনকয়েক মহাপুরুষের ফটো শোভা পাচ্ছে। ডিম লাইটের সঙ্গে চাঁদের জ্যোৎস্না একত্রিত হয়ে অপূর্ব এক ভাবধারার সমন্বয় ঘটিয়েছে। ফটো সমূহের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ফটো-খানা অপেক্ষাকৃত বড়। মনে প্রাণে স্বামীজীর আদর্শেই অনুপ্রাণিত

প্রশান্ত। নিজের হাতে আজও স্বামীজীর ফটোতে মালা দিয়েছে। সংসারে নতুন প্রবেশ করতে চলেছে ও। স্বামীজীর আশীর্বাদ ওর সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতে থাকে প্রশান্ত। গত রাত্রের স্বপ্ন। বেনারস স্টেশন থেকে শুরু করে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত। কিন্তু খাটের পাশে সহসা উনি কে এসে দাঁড়ালেন? স্বামীজী কি? তাঁর মতোই তো সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন। কি বলছেন উনি? প্রশান্ত, চালাকি করো না। চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না। অনিতার প্রেমে পড়েছ তুমি। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেমে পড়ার ইতিহাস জগতে বিরল নয়। সুচরিতা তোমার বাল্য সহচরী। তাকে ভালবাসা তোমার পক্ষে এখন কঠিন। সুতরাং ভেবে দেখো, এ বিয়ে তুমি করবে কিনা…

স্বপ্ন দেখতে দেখতে সহসা ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসে প্রশান্ত। তু'চোখ রগড়িয়ে চারদিক ভাল করে চেয়ে দেখতে থাকে। কই ঘরে তো কেউ নেই! তবে? স্বামীজীর ফটোর দিকেই এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে খানিক। স্বপ্নের প্রতিধ্বনিই যেন আবার শুনতে পায় স্বামীজীর প্রতিচ্ছবি থেকে। হয়তো বা বিবেকের নির্দেশ। তু'চোখ বন্ধ করে খানিক দম ধরে বসে থাকে বিছানার ওপর। তেষ্টায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে উঠেছে। উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখা জলের গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু জল খেয়ে নেয়। তারপর আবার ফিরে আসে স্বামীজীর ফটোর কাছে। একদৃষ্টেই আবার চেয়ে থাকে ফটোর দিকে। চেয়ে চেয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। চোখের ওপর একবার ভেসে ওঠে গতরাত্রের ভ্রমণ-সঙ্গিনী অনিতা আর একবার বাল্যসহচরী সুচরিতা। সুচরিতা, যার গলা জড়িয়ে ধরে আমবাগানে আম কুড়িয়েছে, পাঠশালায় গিয়েছে, মারামারি দৌড়ঝাঁপ করেছে।…

বেশীক্ষণ রেশ রাখতে পারে না প্রশান্ত। আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার এসে বিছানা নেয়। কিন্তু ঘুম তার আসে না। চাঁদের

জ্যোৎস্না ঘর থেকে সরে গেছে। সমস্ত ঘরময় থমথম করছে স্তিমিত অন্ধকার। কেমন যেন ভয় ভয় করে প্রশান্তর। চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে থাকে। মাথার পোকাগুলো কিলবিল শুরু করে দিয়েছে। কে ওকে পথ দেখাবে ?...হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বামীজীর বাণীই জীবন-সত্য। কে অনিতা ? পথের বন্ধু পথের মাঝে হারিয়ে গেছে। জীবনে হয়তো আর কোনদিন দেখাও হবে না। তাছাড়া রাত পোহালেই তো শুরু হবে ঘর বাঁধার কাজ। সুচরিতা বধূ হয়ে আসবে এ বাড়িতে। বাল্যসখী জীবন-সঙ্গিনী হয়ে আসছে। এর চেয়ে মধুর জগতে আর কি হতে পারে ? না না, এ সুখকর পরিবেশকে ও কিছুতেই মাটি হতে দেবে না। কিছুতেই না...আবার মনের জোর ফিরে পায় প্রশান্ত। দেখতে দেখতে পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে ওঠে। ঝাড়ুদাররা রাস্তায় কাজ শুরু করেছে। কল-কারখানার বাঁশিও একটার পর একটা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। শেষরাত্রের অবসন্নতায় তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়ে প্রশান্ত।

সকলের আগে আজ ঘুম থেকে ওঠেন উমা দেবী। আদিনাথও দেরি করেন না। অন্যদিন, কিছুটা বেলায় ওঠা অভ্যাস হলেও আজ প্রায় উমা দেবীর সঙ্গে সঙ্গেই শয্যাত্যাগ করেছেন। একে একে বাড়ির সকলেরই ঘুম ভাঙে। সকালের চা জলখাবারের পাট প্রায় সকলেরই মিটেছে। আদিনাথ ভৃত্যকে সঙ্গে করে একটু সকাল সকালই বাজারে বেরোন। কন্যাপক্ষ আজ সদলবলে প্রশান্তকে আশীর্বাদ করতে আসছেন। বাজার লাগার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হতে না পারলে ভাল মাছ-তরকারি পাওয়া যাবে না। মীনা প্রশান্তর ঘরে এসে দু'বার উঁকি দিয়ে গেছে। না, বেশ অঘোরেই ঘুমুচ্ছেন প্রশান্তদা। ডেকে কাজ নেই। দু'রাত গাড়ি-ঘোড়া দৌড়ে এসেছেন। দু'চোখের পাতা হয়তো এক করতেও পারেন নি। একটু ঘুমিয়ে সুস্থ হয়ে নিক। এরপর তো আবার কয়েক রাত ধকল যাবে ...মীনা একবারও ডাকাডাকি করে না।

প্রশান্ত ঘুমিয়েছিল এইমাত্র জেগেছে। কিন্তু জেগেও ওর বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। আলস্যে সমস্ত শরীর যেন ভেঙে পড়েছে। মনের ওপর দিয়েও যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে। স্বামীজীর ফটোখানার দিকে কেন যেন চোখ তুলে চাইতে পারছে না। কত যেন অপরাধ করে ফেলেছে ও তাঁর কাছে। সত্যি, কেন এমন হয়? সামান্য কয়েক ঘণ্টার ট্রেন-জার্নি। কই, অনিতার মধ্যে তো কোন রকম চাঞ্চল্য দেখা যায় নি! তবে কেন এ দুর্বলতা? না না, স্বামীজী ঠিকই বলেছেন। চালাকি করা আজ আর চলবে না। বর্ধমান থেকে আজ ওঁরা আসছেন আশীর্বাদ করতে। প্রিয় বান্ধবী জীবন-সঙ্গিনী হয়ে আসছে। শুভক্ষণের এইতো সূচনা। এমন দিনে কোন দুর্বলতাই শোভা পায় না। প্রশান্ত মনের বল ফিরে পায়। স্বামীজীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবে এমন সময় সদরে হাঁক শোনা যায়, টেলিগ্রাম—টেলিগ্রাম। ক্রিং ক্রিং শব্দে সাইকেলের বেল বেজে চলেছে। প্রশান্ত কাপড় সামলাতে সামলাতে গাড়ি বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে দেখে, ওদেরই সদরে দাঁড়িয়ে টেলিগ্রাম-পিয়ন হাঁকছে। বাড়িতে উপস্থিত আর দ্বিতীয় কোন পুরুষমানুষ নেই। মেয়েরা সকলেই অন্তঃপুরে রান্নার যোগাড় নিয়ে ব্যস্ত। অগত্যা প্রশান্তকেই নিচে নামতে হয়। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ভাবতে থাকে, হয়তো বিয়ে উপলক্ষে কেউ আসছেন, স্টেশনে গাড়ি পাঠাতে হবে। আদিনাথবাবুর নামে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। সোৎসাহেই ব-কলমে সই দিয়ে খাম খুলে পড়তে যায় প্রশান্ত। কিন্তু একি! এযে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—স্টপ ম্যারেজ, লেটার ফলোজ্, শশিশেখর।...

বেশী কিছু ভাববার অবকাশ পায় না প্রশান্ত। হাঁক শুনে মীনাও অন্তঃপুর থেকে ছুটে আসছিল। মুখোমুখি হতেই প্রশান্ত টেলিগ্রামখানা ওর হাতে দিয়ে আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসে।

মীনা টেলিগ্রামখানার ওপর চোখ মেলতেই আঁতকে ওঠে। কি সর্বনাশ! বড় মা, ও—বড় মা!

মীনার হাঁক-ডাক অন্তঃপুরে মিলিয়ে যায়। প্রশান্ত উপরে উঠে আবার এসে দাঁড়ায় স্বামীজীর ফটোর কাছে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে চোখে চোখ রেখে। ঝড় ওঠে আবার। এতদিন মনের গহনে যে মধু-মল্লিকার বিস্তার কামনা করে এসেছে ও, ফলে ফুলে পরিপূর্ণতা লাভের আগেই কি তা মূল থেকে খসে পড়বে? দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে প্রশান্তর। সুচরিতাকে যেন নাগালের মধ্যেই পায় না। সেদিনের ভ্রমণ-সঙ্গিনী অনিতা যেন চারদিক থেকে খিলখিল করে হাসছে ওর দিকে চেয়ে।

পরদিন দুপুরের ডাকেই আসে শশিশেখরের বিস্তৃত পত্র। অনেক কথাই লিখেছেন শশিশেখর। আগাগোড়া খেদোক্তিতে পূর্ণ। বাড়িতে নিত্য রাধাগোবিন্দ জীউর সেবা আছে। তিন পুরুষের বিগ্রহ। পুজোর জন্য পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। তবু বাড়ির লোকদের সঙ্গে সঙ্গে যোগাড় দিতে হয়। স্কুল ছাড়ার পর সুচরিতার ওপর ভার বাগান থেকে ফুল তোলা, মালা গাঁথা, চন্দন ঘষা। ভক্তি সহকারেই এ কাজ ও করে আসছে। দাদুর কাছ থেকে পেয়েছে প্রেরণা। সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর নিজেও পুজো আহ্নিকে মেতে থাকেন আদিশেখর। ওর ধারণা, সংসারে প্রবেশের আগে মেয়েরা কিছুদিন যদি পুজো-আরচায় মন দেয় তাহলে তাদের চিত্তের দৃঢ়তা বাড়ে। কষ্ট-সহিষ্ণুও হতে পারে তারা। প্রথম প্রথম আদিশেখরকে খুশী করতেই ঠাকুরের কাজে লেগেছিল সুচরিতা। কিন্তু এখন ওর নিজেরও খুব ভাল লাগে। দাদু মত করলে পুরোহিতের বদলে নিজেও ও রাধাগোবিন্দ জীউর সেবার ভার নিতে পারে।

গাড়ি ভোর আটটায়। জনকয়েক শুভানুধ্যায়ীকে সঙ্গে করে প্রশান্তকে আশীর্বাদ করতে কলকাতা রওনা হবেন শশিশেখর।

সুচরিতা ভোরে উঠে বাগান থেকে ফুল তুলে ঠাকুরদালানে বসে মালা গাঁথছিল। মনে আজ খুশীর বান ডেকেছে। গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজছে। প্রশান্তর আশীর্বাদ হয়ে গেলে ওকেও বরপক্ষ আশীর্বাদ করতে আসবেন। তারপর চার চোখের মিলন—শুভদৃষ্টি। আজন্মের আরাধ্য দেবতাকে পাবে জীবন-দেবতারূপে। আহ্নিকে বসবার আগে দাদু কত করেই না রসিকতা করে গেলেন। হ্যাঁ, প্রশান্ত তো ওর চোখের মণিই। বলতে গেলে প্রাণের আধখানা··· স্বপ্নে স্বপ্নে ডুবে যায় সুচরিতা।

চারখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে সদরে লেগেছে। দু'খানাতে যাবেন আশীর্বাদকেরা আর দু'খানাতে তত্ত্বের সামগ্রী। রমা, উমা ওকে অনেক করে টানাটানি করেছে। কিন্তু অত লোকের মাঝে কি করে যায় ও? লজ্জা করে না বুঝি?··· সুচরিতা যতটুকু পারে আড়চোখে ঠাকুরদালান থেকে দেখতে থাকে। কারো সঙ্গে চোখোচোখি হলে লজ্জায় মাথা নামিয়ে নেয়—খুশীর হাওয়া মনে প্রাণে।

মালপত্র একরকম প্রায় সবই বোঝাই শেষ। এক্ষুনি রওনা হওয়া উচিত। স্টেশনে পৌঁছতেও বিশ-পঁচিশ মিনিটের কম লাগবে না। সাতটা প্রায় এখানেই বেজে গেল। শশিশেখর সকলকে তাড়া দিয়ে গাড়িতে উঠতে যান, সহসা ঠাকুরদালানে ঝিয়ের চেঁচামেচি শোনা যায়।

ন্যাতা বালতি নিয়ে উঠোন নিকোচ্ছিল হরিমতী। থেকে থেকে সুচরিতার সঙ্গে রসিকতাও করছিল। কিন্তু একি কাণ্ড, মালা হাতে করে উঠতে গিয়ে দিদিমণি যে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন!—হরিমতীর কণ্ঠে গগনভেদী আর্তনাদ।

সকলের দৃষ্টি এতক্ষণ গাড়ির ওপরে ছিল। ঝিয়ের চেঁচামেচিতে সকলেই এক লহমায় ঠাকুরদালানের দিকে ফিরে তাকায়। শশি-শেখর এক পা গাড়ির পাদানিতে দিয়েছেন ছুটে গিয়ে সুচরিতার

মাথাটি নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। আত্মীয়স্বজনে বাড়ি জম-জমাট। মুহূর্তে ভিড় জমে যায়। প্রাথমিক ব্যবস্থামতো অবিরাম জল-বাতাস চলে। ডাক্তারও ডাকা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। ভাল মেয়ে, এক নিমেষে একি হাল হলো! চোখ মুখ যে ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। শশিশেখর স্থির থাকতে পারেন না। স্ত্রী সুরমাও বোধ হয় মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। আনন্দ মুখর বিয়েবাড়ি একমুহূর্তে বিষাদ-ঘন হয়ে ওঠে। কলকাতায় রওনা হওয়া আর কারো পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। ডাক্তার ম্যানিনজাইটিস বলে আশঙ্কা করছেন।

হইচই অনেকটা শান্ত হয়ে এলে আদিনাথবাবুর নামে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করাই সাব্যস্ত হয়। কোন ক্রমেই আর এ তারিখে বিয়ে হতে পারে না।

বাজার পর্ব শেষ করে বেশ খুশী মনেই বাড়ি ফিরছিলেন আদিনাথ। দাম যদিও বা কিছুটা চড়া হলো, তবু বেশ জুতসই মাছ-তরকারি পাওয়া গেছে। সচরাচর এত ভাল মাছ শিয়ালদহ বাজারে ওঠে না। এখন রাঁধুনী না ডোবালে খাওয়া-দাওয়া ভাল হবারই কথা। মনে মনে রান্নার ফিরিস্তি কষতে কষতেই বাড়ি এসে ঢোকেন আদিনাথ। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! কথা নেই বার্তা নেই বিয়ে হবে না! টেলিগ্রাম পড়ে মুষড়ে পড়েন। আত্মীয়স্বজন সকলকেই নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। কেউ কেউ এসেও পড়েছেন। প্রশান্তই কি কম হাঙ্গামা পুইয়ে এসেছে! অবশ্য বিস্তৃত পত্র না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা ঠিক হবে না। তবু ঘটনাচক্রে যে সন্দেহই জাগে। বর্ধমান থেকে কলকাতা মাত্র তো ঘণ্টা তিনেকের পথ। টেলিগ্রাম না করে একজন কেউ এলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেত। না, রীতিমতো সন্দেহেরই কথা। হয়তো কারো কোন কান ভাঙানিতে শশীবাবু পেছিয়ে যাচ্ছেন। তাই

চক্ষুলজ্জা ঢাকতে এই টেলিগ্রাম। কিন্তু দু'দিন আগে সংবাদ দিতে কি দোষ ছিল? মিছিমিছি একগাদা পয়সার গলায় দড়ি।…আদিনাথ বিচলিত হয়ে পড়েন। তবু দাঁতে দাঁত চেপেই পত্রের অপেক্ষায় থাকেন।

আজ সেই পত্র এসেছে। ছি ছি ছি, কিসে কি ভেবেছি আমি, আদিনাথ নিজের কাছে নিজেই অপরাধী সাব্যস্ত হন। এমন কপালও মানুষের হয়। কোথায় আশীর্বাদ করতে যাবো আর কোথায়… আশঙ্কায় দুরদুর করে বুক কাঁপতে থাকে আদিনাথের। উমা দেবীকে সঙ্গে করে পরের গাড়িতেই বর্ধমান রওনা হয়ে যান। প্রশান্তকেও সঙ্গে নেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নানাদিক ভেবে তা আর পারেন না।

## তিন

তিন দিন পরের কথা। ভোর থেকেই গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রশান্তর মনটা ভাল নেই। জীবনের সব কিছুই যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। ঘর বাঁধার আশা নিয়েই সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে এসেছে। ছুটিও লম্বাই পেয়েছে। সাধ ছিল, বিয়ের পর সুচরিতাকে নিয়ে কোথাও মধু-চন্দ্রিমা উদ্‌যাপনে যাবে। কিন্তু মনের সে সাধ মনেই থেকে গেল। মা-বাবা গতকাল বর্ধমান থেকে ফিরে এসেছেন। সুচরিতা ধকল কাটিয়ে উঠলেও এখনো বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি। দু'দিন পরেই ভাদ্র মাস শুরু হবে। হিন্দু-মতে এ অঞ্চলে ভাদ্র মাসে বিয়ের রীতি নেই। সুতরাং এ যাত্রা নিষ্ফলতার মধ্যদিয়েই ফিরে যেতে হবে। বাবা মুখ ফুটে বললে বর্ধমান থেকে একবার ঘুরে আসা যেত। কতদিন সুচরিতার সঙ্গে দেখা হয় নি। সে তো সেই ছেলেবেলার কথা, একসঙ্গে দু'জনে কিছুকাল কাটিয়েছি। শুধুই পুতুল খেলা। কথায় কথায় ভাব,

কথায় কথায় আড়ি। মনের গভীরে কোন দাগই কাটে নি। সুচরিতার হয়তো কোন কথাই এখন আর মনে নেই। মনের-কলির যখন পাখা মেলবার কথা তখন তো পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন। স্মৃতির সেই ক্ষীণ রেখাটুকু বিস্মৃতির অতলতলেই তলিয়ে ছিল এতদিন। কিন্তু শশিশেখর তাঁর কর্মজীবনের বন্ধনকে মুছে ফেলতে রাজী হলেন না। সুচরিতার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে নিবিড় আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা পাকে পাকে বাদ সেধে চলেছেন। এর আগেও একবার বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল। এবার তো শুধু সাতপাক বাকী। আত্মীয়স্বজনদের কাছে নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কেউ কেউ এসেও পড়েছেন। বাড়ি উভয় তরফেরই আনন্দ-মুখর। কিন্তু হলে কি হবে স্বয়ং সুচরিতাই আজ অসুস্থ হয়ে পড়ল,···প্রশান্তর বিকল হৃদয়।

খুব ভোরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে পড়ার টেবিলে এসে বসে প্রশান্ত। মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন দেহ-মন। কবিগুরুর বর্ষার কবিতাগুলোর এক একটা তিন-চারবার করে পড়েও যেন সুরে সুর মেলাতে পারছে না। বর্ষার ময়ূরের মতোই আজ ওর নাচবার কথা ছিল। কিন্তু পা আজ ওর নিথর-নিস্তব্ধ। মনের গহনে এসে বাসা বেঁধেছে জমাট-বাঁধা কালো মেঘ। শুধুই কালো। পাশেই রেডিওটা খোলা রয়েছে। গান আর বাজনা একটার পর একটা এতক্ষণ ধরে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশান্তর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সহসা বিখ্যাত এক শিল্পী দরদী কণ্ঠে সুর ধরে, "এই শ্রাবণের বুকের ভেতর আগুন আছে"···

যেন অতর্কিতে হৃদয়ের সত্তা খুঁজে পায় প্রশান্ত। সত্যি, আগুনের শিখাই জ্বলছে আজ ওর বুকের ভেতরে। গান নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়ে যায় কিন্তু প্রশান্তর আত্মা তখনও সুরের মূর্ছনায় মন্দ্রিত। কাব্য বন্ধ ক'রে গদ্যে মন দেয় প্রশান্ত। এক সময় মোটামুটি ভালই গল্প লিখতে পারতো ও। দীর্ঘকাল অনভ্যাসে হাতটা আজ আর তেমন চালু নেই। তবু বর্ষার বৃষ্টি ধারায় বেঙের ছাতার মতোই মগজে সে

খেয়াল গজিয়ে ওঠে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গল্পই লিখবে ও। সেই হারিয়ে যাওয়া অতীতের রূপকথা। কলম নিয়ে তৎপর হয় প্রশান্ত। আঁচড়ে আঁচড়ে এগিয়ে যায়ঃ "সে এক-স্বপ্নে পাওয়া দেশ। সেই দেশেরই এক রাজকুমার। রাজা-রাণীর একমাত্র আদরের দুলাল। বয়স আর তার কতই বা হবে! সাত কি আট। ফুটফুটে চেহারা—বুলবুলির মতো বুলি। একদিন রাজমাতা রাজকুমারকে বলেন, তোমার রাণী কইগো রাজপুত্তুর?

রাজকুমার খিলখিল করে হেসে উত্তর দেয়, আসবে গো আসবে। টুকটুকে রাণী আসবে আমার।

রাজমাতা গাল ফুলিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, কবে আসবে সেই আশাতে বসে আছো। তার চেয়ে আমাকেই তোমার রাণী করো না?

ধেৎ, তোমাকে রাণী করবে কে? তুমি তো বুড়ো, দাঁত ফোগলা! আমার রাণী দেখো কত সুন্দর হয়। তার থাকবে তারার মতো দুটো চোখ।

রাজকুমারের রাণী সত্যি সত্যি একদিন এল। স্বপন পুরীর রাজার অতিথি হয়ে এলেন আর এক রাজ্যের মস্ত বড় রাজা-রাণী। সঙ্গে তাদের ছোট্ট এক রাজকুমারী। রাজকুমারীর দু'চোখে সত্যি সত্যি তারারই রোশনাই। রং দুধে-আলতায়। রাজায় রাজায় যেমন গলায় গলায় ভাব—রাজকুমার আর রাজকুমারীতেও তেমনি। দু'জনে এক সঙ্গে খায়—এক সঙ্গে শোয়—এক সঙ্গে খেলা করে। তাই দেখে বুড়ো রাজমাতা একদিন রাজকুমারকে শুধোন, এই কি তোমার রাণী নাকি গো?

রাজমাতার কথা শুনে রাজকুমারের কেন যেন লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। মুখে আর কোন জবাব দিতে পারে না। আহ্লাদে দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে রাজকুমারীর। রাজকুমারীও রাজ-কুমারের গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকে।

তারপর কিছুদিন যাবার পর অপর রাজ্যের রাজা-রাণী নিজের রাজ্যে ফিরে যান। সঙ্গে রাজকুমারীও। মুখে কেউ কোন কথা বলতে পারে না। দু'জনেরই চোখ জলে ভরে আসে। রাজকুমারের বুকের ভেতরটা রাজকুমারীর জন্য দিনকতক খুব পোড়াতো। রাজকুমারীরও রাজকুমারের জন্যে। মাঝে মাঝে চিঠিও লিখতো এ ওর কাছে। তারপর বড় হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন লজ্জা হতে লাগল। দু'জনেরই চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু দু'জনের মনে দু'জনেই রইল বাসা বেঁধে।

রাজকুমার এখন সাবালক। সে এখন সপ্তডিঙা ভাসিয়ে দেশে বিদেশে বাণিজ্যে রত। রাজকুমারীও মন্দিরের বিগ্রহের জন্য মালা গাঁথে আর বসে বসে ভাবে। বুড়ী ঝি যে রাজকুমারীকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে, উঠোন নিকোতে নিকোতে টিপ্পনী কাটে, কার কথা ভাবছো গো রাজকুমারী, স্বপন পুরীর রাজকুমার বুঝি চিঠি দিয়েছেন?

রাজকুমারীর লজ্জা-নম্র চোখ মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। বলে, ধেৎ—

ধেৎ নয় গো, আমি সব বুঝতে পারি।

পারিস তো পারিস। কিন্তু তোর কাজ শেষ হবে কখন, পুজোর সময় যে হয়ে এল।

ঝি আপন ঢঙেই পাল্টা জবাব দেয়, আমার জন্য ভাবতে হবে না গো। আমি কর্তা মশায় আসার আগেই সব সেরে দিতে পারবো। কিন্তু তোমার মালা গাঁথার কি হলো?

আমার জন্যেও তোকে ভাবতে হবে না।

তা না হলেই বাঁচি বাছা। কিন্তু এমনি করে পাষাণের জন্যে আর কতদিন মালা গাঁথবে?

আবার ফাজলামো করছিস, রাজকুমারীর কণ্ঠে কৃত্রিম শাসনের সুর।

ধমক খেয়ে সেদিনের মতো আর কোন কথা বাড়ায় না ঝি। নিজের নিয়মিত কাজেই মন দেয়।

দিনকয়েক পর আবার একদিন উভয়ের মধ্যে খুশীর হাট বসে। রাজকুমারী রোজকার মতো ফুলের সাজি নিয়ে মালা গাঁথতেই বসেছে কিন্তু মন তার বড় উচাটন। জামার ভেতর থেকে রাজকুমারের একখানা ফটো বার করে চুপি চুপি দেখছে আর খুশীতে রাঙা হয়ে উঠছে। ছেলেবেলার ছবি। পরস্পর পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের দুটিকে। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায় রাজকুমারী।

বুড়ী ঝি ইতিমধ্যে মন্দির ঝাঁট দিতে এসে তামাসা জোড়ে, কি গো রাজকুমারী, রাধাগোবিন্দজী দর্শন করছ নাকি ?

রাজকুমারীর চমক ভাঙে। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না।

ঝি সায় দেয়, বুঝেছি গো বুঝেছি। আমি আজকেই কর্তা মশায়কে বলছি, রাজকুমারের খোঁজ করুন।

ভাল হবে না কিন্তু—

ঝি মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর করে, তা না হয় না-ই হবে, মিষ্টি তো খেতে পারবো।

তারপর সত্যি সত্যি একদিন রাজকুমারের খোঁজ হয়। স্বপন পুরীর রাজাও প্রস্তাব শুনে খুশী হন। রাজকুমার আর রাজকুমারীর চার হাত এক করে দিতে উভয়েই দিন স্থির করে ফেলেন। কিন্তু সহসা কন্যা পক্ষের জ্ঞাতি বিয়োগে সে যাত্রা উৎসব বন্ধ রাখতে হয়। তারপর আবার একবার দিন স্থির হয়। রাজকুমার বাণিজ্য থেকে সপ্তডিঙাসহ রাজধানীতে ফিরে আসে। সঙ্গে আনে রাজকুমারীর জন্য চম্পক হার আর গজমতির মালা। এবার প্রায় সবই ঠিকঠাক। দু'রাজবাড়িতেই তোড়জোড় চলে। কিন্তু সহসা এবারও বাধা পড়ে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ বিয়ের দু'দিন আগে মন্দির-প্রাঙ্গণে মাথা ঘুরে পড়ে যায় রাজকুমারী। এদিকে রাজকুমারকেও বোধ হয় ডাইনীতে ধরেছে। সে কেবলই বসে বসে দুঃস্বপ্ন দেখছে…"

গল্প ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছে প্রশান্তর। অনেক দিন অভ্যাস নেই, লিখতে লিখতে হাঁপিয়ে ওঠে। আর এক কাপ চা না হলে কিছুতেই এগোনো সম্ভব নয়। বৃষ্টি বেশ জোরেই শুরু হয়েছে। কিন্তু কাকেও ডাক-হাঁক করবার দরকার হয় না। মীনা দু'কাপ চা ও খানকয়েক পাঁপর ভাজা নিয়ে সময়মতোই ওপরে আসে। ইচ্ছে, প্রশান্তর সঙ্গে গল্প জুড়ে ওকে চাঙ্গা করে তোলা। বেচারা, দু'বার করে আঘাত পেল।

চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে মীনা প্রশ্ন করে, ওটা কি লেখা হচ্ছে ?

হেসে প্রশান্ত উত্তর দেয়, রূপকথা।

রূপকথা !

কেন, লিখতে জানি না নাকি ?

না, তা জানবে না কেন, তবে এ পর্যন্ত তো বড়দের জন্যই লিখে আসছ।

এবার রূপকথাই লিখবো স্থির করেছি।

বেশ তো, শোনাও না কি লিখেছ ?

এখনো যে শেষ হয় নি।

তা হোক, যা হয়েছে তাই শোনাও।

আচ্ছা বোস, প্রশান্ত এক টুকরো পাঁপর চিবোতে চিবোতে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

মীনাও নিজের পাত্রে চুমুক দিয়ে জেঁকে বসে।

আবেগ জড়িত কণ্ঠে আরম্ভ করে প্রশান্ত। পড়তে পড়তে ভাবে তন্ময় হয়ে যায়। একবারও মীনার দিকে মুখ তুলে তাকায় না।

শুনতে শুনতে মীনাও অভিভূত হয়ে পড়ে। শুরুতেই বুঝতে পারে, এ কাহিনী প্রশান্তদার নিজের।

পড়তে পড়তে হঠাৎ শেষ পংক্তিতে এসে থেমে যায় প্রশান্ত।

মীনা বুঝতে না পেরে ঔৎসুক্য জানায়, তারপর ?

তারপর আর নেই, হাসতে থাকে প্রশান্ত।

বলো কি, রাজকুমারকে শেষটায় ডাইনীতে ধরল! মীনার দু'চোখ বিস্ময় বিস্ফারিত।

তাই তো ধরল মনে হয়।

তা হলে উপায়?

উপায় একটা বার করতেই হবে।

না না, ডাইনীর হাতে কিছুতেই রাজকুমার পড়তে পারেন না। আমি কিছুতেই তা হতে দেবো না, কিছুতেই—

কি আশ্চর্য, একটা রূপকথার গল্প নিয়ে তুই এত খেপে উঠছিস কেন?

মীনা বিস্ফারিত চোখেই পুনরায় শুধোয়, সত্যি বলছো, এ রূপকথা?

বোকা কোথাকার, রূপকথা নয় তো কি?

মীনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভিন্ন পথে পা বাড়ায়। বলে, আচ্ছা প্রশান্তদা, চলো না, আমরা একদিন বর্ধমান থেকে ঘুরে আসি।

দূর পাগলী, তা কি করে সম্ভব?

কেন নয়? কাকামণিও তো তাই বলছিলেন।

বলছিলেন বুঝি?

না, ঠিক তা বলেন নি। তবে আমি বললে উনি অমত করবেন না।

নারে, তা হয় না।

কেন হয় না? ছেলেবেলায় এত মেলামেশা করেছ আর এখন রোগা মানুষটাকে একবার দেখতে গেলেই বুঝি দোষ হবে?

দোষগুণের কথা নয় রে, এখন—

লজ্জা করছে, কেমন?

সত্যি তাই।

ও কিছু নয়। তুমি রাজী থাকো তো বলো, আমি কাকামণিকে বলি।

আচ্ছা পরে তোকে ভেবে বলবো। এখন গল্পটা শেষ করতে দে।

না, ও ডাইনীর গল্প আর তোমাকে শেষ করতে হবে না, বলতে বলতে চায়ের কাপ-ডিস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় মীনা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবে, ডাইনী—ডাইনী, ডাইনী কে? প্রশান্তদা কি তবে মুষড়ে পড়লেন! ডাইনীর নাম করে তবে কি অন্য কোন মেয়েরই ইঙ্গিত করছেন! কিন্তু কোন হদিস পায় না মীনা।

প্রশান্ত একাকী ঘরে বসে গভীরভাবে ভাবতে থাকে। কিছুতেই আর গল্পের মাল-মসলা খুঁজে পায় না। খাতা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরায়।

বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয়-কুটুম যারা এসেছিল একে একে সকলেই বিদায় নিয়েছে। একমাত্র মীনা এখনো যায় নি। কারণ, সে তো আর কুটুম নয়—ঘরের মেয়ে। সকল ঝামেলা চুকিয়েই যাবে। মীনার স্বামী রথীন্দ্রনাথও দুঃসংবাদ পাবার আগেই এসে পড়েছিল। এর আগে ওর সঙ্গে প্রশান্তর তেমন মেলামেশা ছিল না। এবার দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়ে ওঠে। দু'জনেই ডাকঘরে চাকরি করে। তাই বিচ্ছিন্ন না থেকে এক সঙ্গে এক জায়গায় থাকবার জন্যই আব্দার জানায় রথীন্দ্র। পদমর্যাদা হিসেবে প্রশান্তদা এক ধাপ উঁচুতলার লোক। চেষ্টা করলে উনি নিশ্চয় কৃতকার্য হতে পারবেন—রথীন্দ্র সুখের স্বপ্নই দেখে।

বিয়ে না হওয়ায় গোটা বাড়িটাই থমথম করছিল। কিন্তু রথীন্দ্রকে দিনকয়েকের জন্য কাছে পেয়ে তবু একটু হাঁপ ছাড়তে পারে প্রশান্ত। খুব আমুদে ছেলে যা'হোক—মনটা খুশীতে ভরা।

রথীন্দ্র চলে গেছে, ছুটি প্রশান্তরও ফুরিয়ে এসেছে। এখান থেকে ও-ও চলে যেতে পারলে বেঁচে যায়। কি দরকার ওর এই যক্ষপুরীতে

বসে বসে দিন গোণার? রথীন্দ্র চলে যাবার পর থেকে তো কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলবারও উপায় নেই। মীনা সাধ্যমতো চেষ্টা করে ওকে খুশী রাখতে। কিন্তু সে তো শুধুই ব্যর্থ প্রয়াস। ছোট বোন, ওর গণ্ডী আর কতটুকু। প্রশান্ত আগামীকাল ভোরেই যাত্রা করবে। উমা দেবী চেষ্টা করেছিলেন, অশুভ ভাদ্র মাসে একমাত্র ছুলালকে বিদেশে পাঠাবেন না। বরাত তো সব দিক থেকেই মন্দ। বলা যায় না, কিসে কি হয়। কিন্তু প্রশান্ত কিছুতেই রাজী নয়। আদিনাথ সবই বোঝেন। সুতরাং স্ত্রী আর পুত্র উভয়ের মান রাখতে গণৎকার ডেকে ভাল একটি দিন বেছে দেন। উমা খুশী হতে না পারলেও এ ব্যবস্থায় কতকটা শঙ্কা কাটিয়ে ওঠেন। মনের খেদ মনেই চাপা দিয়ে প্রশান্তর যাত্রার উদ্যোগ করে যান। বাড়ির সকলেই ভাবগম্ভীর। মীনার ছু'চোখও জলে টৈটুম্বুর। আড়ালে কেঁদেছেও বারকয়েক। কিন্তু উপায় নেই। আর তো সেই মাঘ-ফাল্গুন মাসের আগে বিয়ের কোন দিন নেই। সুতরাং প্রশান্তদাকে ধরে রেখেই বা কি হবে। শুধু শুধু মায়া বাড়ানো। তার চেয়ে ভালয় ভালয় এ ক'টা মাস কেটে গেলেই ভাল। ভাগ্যে যদি থাকে তখনই না হয় আমোদ-আহ্লাদ হবে।—মীনা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। ··

প্রশান্তর মনটাও ভারাক্রান্ত। এই প্রথম ও মায়ের ইচ্ছায় বাধা দিল। ছুটি তো ইচ্ছে করলেই পেতে পারে ও। কিন্তু এখানে মুখ বুজে কি করে থাকবে। মীনাও ছু'দিন পরেই চলে যাচ্ছে। সবই ভাগ্য। কোথায় সুচরিতাকে নিয়ে কোথাও মধুচন্দ্রিমা যাপনে যাবার কথা আর কোথায় নিঃসঙ্গ যাত্রা। মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। না না, ও আর এ নিয়ে ভাববে না। নিয়তি যেখানে খুশি ওকে হাত ধরে নিয়ে যাক। এখানে আর নয়।···

অনিতা এবং বিশ্বপতিবাবুর ফেলে যাওয়া জামা-কাপড়গুলো গাড়ি থেকে ও তুলে এনেছিল। ছু'দিন হয় ডাইয়িং ক্লিনিং থেকে

ওগুলো ধুইয়ে এনেছে। গোড়ায় ঠিক করেছিল পার্সেল করে পাঠিয়ে দেবে। ডাকে পাঠাবার মতো প্যাকেট করাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে মত পালটাতে হয়েছে। বর্ধমানের ওপর দিয়েই আবার ওকে ফিরে যেতে হচ্ছে। বলা যায় না, অনিতার সঙ্গে আবার দেখা হয়েও যেতে পারে। ও-ও তো বর্ধমান থেকেই উঠবে। সেখানেই তো নেমেছিল। ভালই হলো, জামা-কাপড়ের সূত্র ধরেই লজ্জা কাটানো যাবে। এক সঙ্গে এসেছি গল্প করতে করতে আবার এক সঙ্গেই ফিরবো। গাড়িতে অন্যপর কেউ না থাকলে ইচ্ছে মতো গানও শোনা যাবে। বড় অদ্ভুত গায় মেয়েটি। ···যাত্রার আগের দিন রাত্রে শুতে গিয়ে এলোমেলো ভাবতে থাকে প্রশান্ত। প্যাকেট খুলে জামা-কাপড়গুলো নিজের সুটকেসের মধ্যেই গুছিয়ে রাখে। সারা রাত কল্পনার জাল বুনে যায়। একবার মনে হয়, আচ্ছা, অনিতা যদি সুচরিতার কেউ হয়। যদি ওর···না না, তা কখনো হতে পারে না। তা হলে কি সেদিন অত কথা-বার্তার মধ্যে সব বেরিয়ে পড়ত না। অনেক কথাই তো হলো। নিশ্চয় বলত, আত্মীয়ের বিয়েতে যাচ্ছি। দুদিন পরেই ফিরবো···

মেয়েদের আবার ঐ এক ধরণ। অন্য মেয়ের নাম শুনেছে কি ভাল করে কথাই বলবে না। ভাবখানা, আমি থাকতে আবার অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে যাওয়া কেন? যাকগে, দেখা যদি হয়েই যায়, আমি তো আর পরিচয় জানতে যাচ্ছিনে। তাছাড়া তার প্রয়োজনই বা কি? কেবল তো পথে মিলে-মিশে যাওয়া—ভ্রমণ সঙ্গিনী।···ভাবতে ভাবতে স্বপ্নে ডুবে যায় প্রশান্ত।

তুফান মেল। কলকাতা থেকে একটানা গিয়ে বর্ধমান দাঁড়াবে। মাঝখানে আর কোন স্টেশন নেই। মীনা, আদিনাথ, উমা সকলেই প্রশান্তকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছিলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রশান্তকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছেন ওরা। জলভরা চোখে প্রশান্তও সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। সুদূর লক্ষ্ণৌ, কে

জানে আবার কবে দেখা হবে। যতক্ষণ দৃষ্টি যায় জানালা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রশান্ত। বাঁক ঘুরতেই মনটা ঝংকার দিয়ে ওঠে। মা, বাবা, মীনা সকলকেই রেখে যাচ্ছে ও। যেন জন্মের মতোই যাচ্ছে। মনের ভেতরটা হুহু করতে থাকে। মা-মণি বলছিলেন, আর কয়েকটা দিন থেকে যেতে। ইচ্ছে করলেই ও তা পারত। কি আর এমন কাজ লক্ষ্ণৌতে। সুচরিতাকে পাশে পেলে দীর্ঘ দিনের ছুটি নেওয়াই তো ঠিক ছিল। তবে কি মা-মণি ওর কেউ নন! এতটা স্বার্থপর ও কি করে হতে পারল!···প্রবাসে দীর্ঘদিন আছে কিন্তু এর আগে আর কখনো মার জন্য ভেতরটা এমন করে পোড়ায় নি। ঝোঁকের মাথায় রওনা হয়ে অনুশোচনাই হয় প্রশান্তর। ঠিক করতে পারে না বর্ধমানে নেমে আবার কলকাতায় ফিরে যাবে কিনা।···

হঠাৎ বর্ধমানের কথা মনে পড়তে চিন্তার বিবর্তন ঘটে প্রশান্তর। একখানি সুচারু মুখ সহসা যেন মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বান্ধবীর অনুরাগ দিয়েই যেন অনিতা ওকে সামনের দিকে হাতছানিতে ডাকছে। পেছনের ভাবনা আর ভাবতে পারে না প্রশান্ত। ওদিককার সবগুলো দোর-জানালাই যেন সহসা কে তুড়দাড় করে বন্ধ করে দেয়। মা, বাবা, মীনা কাউকে আর দেখতে পায় না। পেছনের সবকিছুই যেন ঘন অন্ধকারে তলিয়ে যায়। পথ চলার আলো শুধু সামনেই। গাড়ি চলছে না তো যেন বিরাট একটা দৈত্য হুঙ্কার ছেড়ে উড়ে চলেছে। নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছে স্টেশনের পর স্টেশন। কিন্তু প্রশান্তর তবু মনে হচ্ছে, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। বর্ধমান পৌঁছুতে আর কতক্ষণ লাগবে! না না, আর বেশী দেরি নয়। নির্দিষ্ট সময়েই যাচ্ছে গাড়ি। আর তো মাত্র পাঁচ মিনিট। সামান্য এই সময়টুকু কাটলেই দেখা হবে অনিতার সঙ্গে—সেই ফুটফুটে হরিণ-চোখো মেয়েটি।···হাত-ঘড়িতে নজর পড়তেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে প্রশান্ত। অতীতের সমস্ত গ্লানিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে।

দু'চোখের কোণে এখনো নোনা জলের দাগ রয়েছে। ছি ছি ছি, অনিতা জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবে ও! মা-মণিকে তো সবল সুস্থই রেখে এসেছে, তবে কেন এ দুর্বলতা!…প্রশান্ত উঠে বাথরুমে যায়। চোখে মুখে জল দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটা আঁচড়িয়ে নেয়। না, বেশ উজ্জ্বলই দেখাচ্ছে এখন ওকে। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়। মেল ট্রেন। সুতরাং তেমন কোন ভিড় নেই। মাত্র জনকয়েক ওঠানামা করে। যথারীতি জল নিয়ে ইঞ্জিনও আবার এসে গাড়ির সঙ্গে লাগে। সময় আর নেই। এক্ষুনি হয়তো গাড়ি চলতে শুরু করবে। প্রশান্ত হাঁপিয়ে ওঠে। দু'চোখের দৃষ্টি দিয়ে কোথাও খুঁজে পায় না অনিতাকে। সময় থাকলে একবার গোটা গাড়িটাই ঘুরে দেখে আসত। কে জানে, ভিড়ের মাঝে দৃষ্টিভ্রম হলো কিনা।

গাড়ি হুঙ্কার ছেড়ে আবার চলতে থাকে। কিন্তু প্রশান্ত নিজকে নিজে হারিয়ে বসে আছে। কোথা দিয়ে যে পথ-ঘাট পার হয়ে যাচ্ছে ও তার একবিন্দুও জানতে পারছে না। বরাত এমন মন্দ যে, গাড়িতে দ্বিতীয় কেউ নেই ওকে বোঝে। সত্যি, এমন নিরালায় সেদিনের মতো আজ যদি অনিতা পাশে থাকত। মায়াবিনী, মাত্র ঘণ্টা কয়েকের সান্নিধ্যেই কেমন মনের কোণে বাসা বেঁধে আছে।…ভাবতে ভাবতে এক সময় আপন মনেই ধাক্কা খায় প্রশান্ত, একি নিছক কল্পনার জাল বুনছি আমি! একদিন যা কার্যকারণে ঘটেছিল রোজ রোজ তা ঘটতে যাবে কেন? মাত্র একটি দিনের ভ্রমণ-সঙ্গিনী। সেই দিনটির শেষেই তো সে নাট্যের যবনিকা পাত ঘটেছে। ও কেন আমার কথা ভাবতে যাবে! কি দায় পড়েছে ওর! এ তো নিছকই সৌজন্য বোধ! নয়তো ঠিকানা চেয়ে নিয়েছে, ইচ্ছে থাকলে কি আর পত্র দিতে পারত না ও। ছি ছি ছি, অনেক আগেই ওদের জামা-কাপড়গুলো পার্সেল করে পাটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ডক্টর দাশগুপ্তই বা কি ভাববেন।…প্রশান্ত বর্ধমান স্টেশনের জন্য

এক সময় যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল এখন আবার তেমনি মুষড়ে পড়ে। ভাবতে ভাবতে চোখের ওপর মার করুণ মুখখানিই ভেসে ওঠে আবার। বেচারা মা-মণি, একমাত্র সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় কত করেই না বারণ করেছিলেন। সত্যি, ওঁর কথামতো যদি আর ক'টা দিনও থাকতাম।...গাড়ির গতি যত বাড়ছে প্রশান্তর মনের ভেতরটা ততই যেন হুহু করতে থাকে। কিন্তু উপায় নেই। পেছনে ফেরার আর উপায় নেই। এগিয়ে ওকে যেতেই হবে।

তুফান মেল—গতির বেগ তীব্র। নগর প্রান্তর কাঁপিয়ে স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে চলছে। ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে পড়ে প্রশান্ত। এক সময় ঘুমিয়েই পড়ে। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলেও আর উঠে বসে না। বড় অবসন্ন মনে হয়। মা, মীনা কাছে থাকলে হয়তো ডেকে খাওয়াতেন। কিন্তু গাড়িতে আর কে আছে। সমস্ত দিনে রাত্রে কিছুই প্রায় খাওয়া হয় না। নেশার বসে গোটা কতক সিগারেট টেনেছে মাত্র।

পরের দিন ভোর পাঁচটায় গাড়ি কাশীতে পৌছয়। কিন্তু প্রশান্ত তেমন উৎসাহ বোধ করে না। ভাবে, কি দরকার নেমে। বাকী পথের টিকিট কেটে সোজা লক্ষ্ণৌতেই ফেরা যাক। অনিতা হয়তো এখনো ফেরে নি। আর ফিরলেই বা কি। মিছিমিছি ভাবনার জাল বোনা।...মাঝ পথে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক প্রশান্তর কামরায় উঠেছিলেন। তিনি কাশীতেই নামলেন। ওঠা-নামার যাত্রীরা সকলেই ব্যস্ত। শুধু প্রশান্তই যা নিশ্চেষ্ট। না, এভাবে দোটানায় থেকে লাভ নেই। যা করার এক্ষুনি ঠিক করতে হবে। মনকে যতই শক্ত করে বাঁধতে যায় মন যেন ততই অবাধ্য হয়ে ওঠে। প্রশান্ত আর ভাবতে পারে না। অন্ধ নিয়তি যেদিকে খুশি ওকে হাত ধরে নিয়ে যাক। নামাই ঠিক হয়। সামান্য একটা সুটকেস আর হোল্ড-অল। এক লহমায় প্রস্তুত হয়ে নেয় প্রশান্ত। একের পর এক কুলি এসে হাঁকছিল। একজনকে ডেকে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে

আসে। কিন্তু তা যেন হলো এখন ও যায় কোথায়? ইউনিভার্সিটিতে না ডক্টর দাশগুপ্তর বাসায়? এত সকালে কি আর ইউনিভার্সিটি খুলেছে? যেতে হচ্ছে ওকে বাসাতেই। কিন্তু সেও তো দূর কম নয়। স্টেশন থেকে লাক্‌সা অনেকটা পথ। একটা এক্কা করাই সবদিক থেকে সুবিধের। খানিক ইতস্তত করে এক্কার দিকেই ছোটে। সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সব এক্কাওয়ালা। ইঙ্গিত মাত্র জনকয়েক এসে ছেঁকে ধরে। প্রশান্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কোন্‌টায় উঠবে স্থির করতে পারে না। হঠাৎ কানের পাশে মিষ্টি সম্বোধনে আঁতকে ওঠে। অনিতাও এই গাড়িতেই ফিরেছে। একাই একখানা এক্কা ভাড়া করে রওনা হতে যাচ্ছিল। হঠাৎ নজর পড়ায় এক্কা থেকে নেমে ছুটে এসেছে। আশাতীত খুশী হয়ে প্রশান্তকে অভ্যর্থনা জানায়, আসুন।

পাশ ফিরে প্রশান্ত থ বনে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকি স্বপ্ন দেখছে! এ যে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের চেয়েও অত্যাশ্চার্য ঘটনা! অনিতার অভ্যর্থনার জবাবে মুখে কিছুই বলতে পারে না। শুধু চোখে চোখ রেখে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

অনিতা ওর মনোভাব বুঝে হালকাভাবেই আরম্ভ করে, ভয় নেই, আমি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কাপালিক নই। দয়া করে অনুসরণ করুন।

এবার প্রশান্তর ধ্যান ভাঙে। সহাস্যেই জবাব দেয়, ভরসাও কিছু নেই। কে জানে, কোন মায়াবিনীর মায়া কিনা!

গবেষণা পরে করবেন, এখন অসুন, প্রশান্তকে বাধা দিয়ে কুলিকে নিজের এক্কা দেখিয়ে তাড়া দেয় অনিতা।

অন্যান্য এক্কাওয়ালারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসতে থাকে। দু'একজন অস্পষ্টভাবে কি যেন মন্তব্যও করে। কিন্তু ওরা কেউ সে কথায় কান দেয় না। যুগলে এসেই এক্কায় ওঠে। পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসে। কুলির ভাড়া চুকে গেলে এক্কাওয়ালা ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে। ঝুনঝুন শব্দে চলতে শুরু করে এক্কা।

খানিকটা এগুতেই প্রশান্ত প্রশ্ন করে, এত ভোরে আপনি কোত্থেকে ?

হেসে অনিতা বলে, যদি বলি স্বপনকুমারকে অভ্যর্থনা জানাতে !

তা কি করে সম্ভব !—প্রশান্তর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

আমি যে মায়াবিনী—যোগবলে জানতে পেরেছি। অনিতা হাসতেই থাকে।

তামাসা রাখুন, কোত্থেকে আসছেন বলুন তো ?—আবার প্রশ্ন করে প্রশান্ত।

আমি তো কলকাতা থেকেই আসছি, সহজভাবেই জবাব দেয় অনিতা।

দু'চোখ কপালে তুলে বিস্ময় জানায় প্রশান্ত, সত্যি !

অনিতা নিজের ঢঙেই জবাব দেয়, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি !

প্রশান্ত সে প্রশ্নের সরাসরি কেন জবাব না দিয়ে বলে, কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন, কেউ কাউকে দেখতে পেলাম না।

আমারই বরাত মন্দ, কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে অনিতার কণ্ঠস্বরে।

উত্তরে প্রশান্ত বলে, বরাত আপনার মন্দ হতে যাবে কেন। আমাকেই যা সারাটা পথ মুখ বুজে আসতে হলো।

কেন, আজও গাড়িতে কেউ ছিল না নাকি ?

ছিল কিন্তু পোষাল না।

তার মানে ?

মানে ইয়া গোঁফ-দাড়িওয়ালা এক পঞ্চ-নদ বীর।

ইস্, খুব আপসোসের কথা তো। কোথায় রাজ-পুত্র আসছেন পক্ষীরাজে চড়ে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, পাশে থাকবেন যার রাজকুমারী—আর তার বদলে কিনা বেরসিক এক পাঞ্জাবী ! ভাগ্যিস যুদ্ধ বাধে নি !

রাজকন্যা পাশে থাকলে নিশ্চয় তা বাধত, অনিতার উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে প্রশান্ত।

উত্তরে অনিতা মুখ টিপে টিপে শুধু হাসতে থাকে। বলে, রাজপুত্র তাহলে কি করতেন?

এক কোপে প্রতিদ্বন্দ্বীর শির নিতেন।

বীরত্ব বোঝা গেছে। এখন চুপ করে বসুন, এই এক্কাওয়ালা, সামনের ঐ বাঁদিকের গলিতে, প্রশান্তকে বাধা দিয়ে এক্কাওয়ালাকে নির্দেশ দেয় অনিতা।

প্রশান্ত এতক্ষণ বেশ নিঃসংকোচেই পথ চলছিল। সহসা কেন যেন সংকোচ বোধ করে। অনিতার উদ্দেশ্যে বলে, আমি এখানেই না হয় নেমে যাই। পারি তো মাস্টার মশায়ের সঙ্গে বিকেলে একবার দেখা করব।

হেসে অনিতা বলে, রাজপুত্র কি তাহলে সত্যি সত্যি ভয় পেলেন?

প্রশান্ত এক নিমেষে যেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল এক নিমেষেই আবার তেমনি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সোজাসুজি বলে, রাজকন্যা অভয় দিলে অবশ্য ভয় করিনে।

অনিতা মুখ নীচু করে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। গাড়ি এসে সদরে লাগে। সহজভাবেই প্রশান্তকে অভ্যর্থনা জানায় ও, নামুন।

সংকোচ সম্পূর্ণ না কাটলেও অনেকটা সহজ হয়েই গাড়ি থেকে নামে প্রশান্ত।

অনিতা ওকে সঙ্গে করে সরাসরি ডক্টর দাশগুপ্তর পড়ার ঘরে এসে হাজির হয়। কেননা, ও জানে, ডক্টর দাশগুপ্ত ছাড়া পরিবারের অন্য কারও সঙ্গে প্রশান্তর পরিচয় নেই। একমাত্র উনিই ওকে প্রাণ খুলে সম্ভাষণ জানাতে পারেন।

## পাঁচ

খুব ভোরেই ডক্টর দাশগুপ্ত ঘুম থেকে ওঠেন। হাত-মুখ ধুয়ে পড়ার টেবিলে এসে বসার অনেক পরে সূর্যোদয় হয়। আজও উনি অনেকক্ষণ হয় বসেছেন এবং খবরের কাগজের ওপর মোটামুটি চোখ বোলানোও প্রায় হয়ে গেছে। এখন চায়ের কাপটা হাতের কাছে পেলেই পুরো আমেজ আসে। কে জানে, এখনও উনুনে জল চেপেছে কিনা! ডক্টর দাশগুপ্ত চায়ের নেশাতেই হয়তো কাগজের ওপর থেকে চোখ তুলে এক ঝলক দরজার দিকে তাকাতে যান। হঠাৎ চোখ পড়ে অনিতা প্রশান্তর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে লাফিয়ে ওঠেন, আরে তোমরা! দু'জনে এক সঙ্গেই এলে নাকি? বেশ—বেশ—

উত্তরে অনিতা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। কিন্তু প্রশান্ত কেমন যেন ভড়কে যায়। ডক্টর দাশগুপ্ত কি তাহলে ওকে কটাক্ষ করেই কিছু বলতে চাচ্ছেন। অনিতার সঙ্গে দেখছি দেখা না হলেই ছিল ভাল। আমতা-আমতা করেই প্রশান্ত ডক্টর দাশগুপ্তর প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করে, না—মানে, এখানকার জেনারেল পোস্ট অফিসে আমার একটা জরুরী এন্‌কোয়ারী আছে। তাই ফেরবার পথে নামতে হলো। কিন্তু স্টেশনে পা দিতেই ওঁর সঙ্গে দেখা। উনি কিছুতেই ছাড়লেন না।

খুব ভাল কাজ করেছে অনু। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা না হলে কি তুমি আসতে না?—বিস্ময়ের সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করেন ডক্টর দাশগুপ্ত।

ডক্টর দাশগুপ্তর অভিব্যক্তিতে মনে অনেকটা বল পায় প্রশান্ত। সহজভাবেই উত্তর দেয়, ফেরবার পথে নিশ্চয় আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে যেতাম স্যার।

ফেরবার পথে! হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট! আমি এখানে রয়েছি আর তুমি কিনা অন্য জায়গায় উঠবে!

প্রশান্ত এবার আর কোন জবাব দিতে পারে না। মৃদু মৃদু কেবল হাসতে থাকে। ভৃত্য রামলোচন ইতিমধ্যে এক কাপ চা ও কিছু খাবার নিয়ে হাজির হয়।

ডক্টর দাশগুপ্ত ব্রিবত বোধ করেন। তাড়াতাড়ি ওদের দুজনের জন্যও চা জলখাবারের অর্ডার দেন ।

অনিতা বাধা দেয়, আমাদের এখনও হাত-মুখ ধোয়া হয় নি, তুমি খেয়ে নাও।

তাই বলছিস।—অগত্যা, প্রাণ থাকতে তো আর এ হেলথ্-টনিকের অমর্যাদা করতে পারিনে। প্রশান্ত; ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট কাপ লেট মি ড্রিঙ্ক এ্যালোন। সেকণ্ড টাইম আই মাস্ট···

ডক্টর দাশগুপ্ত কথা শেষ করতে পারেন না। অনিতা বাধা দেয়, সেটি আর হচ্ছে না। সকালের বরাদ্দ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

নো নো মাই চাইল্ড, প্লিজ এ্যালাউ মি ওয়ান্স এগেইন ফর দিস্ অনারেবল গেস্ট।

অনিতা উত্তর দেবার আগে পর্দা সরিয়ে লিলি প্রবেশ করে। গদ্‌গদ হয়ে বলে, তোমার জন্য দিদির কাছে আজকে আমি নিশ্চয় সুপারিস করব বাপি। কিন্তু হাতের কাপ আগে শেষ করো। প্রশান্তবাবু চলুন।

ভেরি ওয়েল ভেরি ওয়েল মাই মাদার। আই উইস ইওর গুড লাক, লিলির সমর্থন পেয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েন ডক্টর দাশগুপ্ত।

অনিতা লিলি হাসতে হাসতে উপরের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু প্রশান্ত ওদের অনুসরণ করতে পারে না। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠেই ডক্টর দাশগুপ্তর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে, আমি বলছিলাম কি স্যার—

ডক্টর দাশগুপ্ত বাধা দেন, তোমার কথা পরে শুনব। নাও ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি প্লিজ, বলতে বলতে কাপে চুমুক দেন।

হেসে লিলি বলে, আসুন মিস্টার সেন। কিছুটা কষ্ট না হয় করবেন।

প্রশান্ত লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি নিজেকে শোধরাতে চেষ্টা করে, একস্‌কিউজ মি প্লিজ। আমি আমার একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতেই যেতে চাচ্ছি।

সে না হয় পরে যাবেন, এখন আসুন। লিলি দৃঢ় থেকেই মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।

প্রশান্তর সংকোচ যেন তবু কাটে না। খানিক ইতস্ততই করতে থাকে।

ডক্টর দাশগুপ্ত তাড়া দেন, বড় শক্ত পাল্লায় পড়ছ প্রশান্ত, প্লিজ ফলো দেম্।

প্রশান্ত আর আপত্তি করতে পারে না।। হাসতে হাসতেই লিলি অনিতাকে অনুসরণ করে।

গাড়িতে সব রকম সুবিধেই ছিল তবু প্রশান্তর ভাল ঘুম হয় নি। এলোমেলো চিন্তা মনকে উৎক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। এখন বেশ হালকা বোধ করে। ছাত্রজীবনে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন ডক্টর দাশগুপ্ত। হোস্টেলে থাকতেন ভদ্রলোক কিন্তু তার ভেতরেও আদর-যত্নের ত্রুটি করতেন না। প্রায় অধিকাংশ দিন বিকেলেই ওঁর ঘরে টিফিন করেছে ও। ওকে পড়াশুনোয় সাহায্য করা প্রতিদিনের কাজ ছিল ওঁর। তারপর কোথায় যেন বদলি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সেই থেকে আর খোঁজ রাখা সম্ভবপর হয় নি। আকস্মিকভাবেই আবার গাড়িতে দেখা হলো সেদিন। কিন্তু কি আশ্চর্য, এতটুকু বদলান নি ভদ্রলোক। আজকের এই আতিথেয়তা আরও ব্যাপক। শ্রীমতী দাশগুপ্ত একদিনেই মায়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। লিলি অনিতার তো তুলনাই হয় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে পর্যন্ত রয়েছে বিস্ময়কর শৃঙ্খলা বোধ। একেই বলে সুখী পরিবার। এমনি এক-একটি পরিবার হলেই পৃথিবীতে মানুষের আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে।...খাওয়া-দাওয়ার পর নিরিবিলিতে খানিক ভাবতে থাকে

প্রশান্ত। লিলি আর ডক্টর দাশগুপ্ত সকাল সাড়ে দশটার মধ্যেই ইউনিভার্সিটিতে বেরিয়ে গেলেন। বেরুবার মুখে ওকে উনি বিশ্রাম করতেই বলে গেলেন। একান্ত বাধ্য হয়েই ওঁকে বেরুতে হচ্ছে। তবু ত্রুটি স্বীকার করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করলেন না। অনিতা ওঁর আদেশ মতো আনুসঙ্গিক সব রকম ব্যবস্থাই করে দিয়েছে। সুন্দর একখানা নিরিবিলি ঘর—ধবধবে বিছানা। সারা রাত্রির ক্লান্তির পর একান্ত-ভাবেই এ পরিবেশ কাম্য। কিন্তু প্রশান্ত তবু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না। ডক্টর দাশগুপ্ত বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হতে থাকে—ও এসে বলেছে স্থানীয় জেনারেল পোস্ট অফিসে জরুরী কাজ ওর। কাজ রেখে ঘুমোলে সকলে ভাববে কি! না না, তা কখনো হতে পারে না। ডক্টর দাশগুপ্তর কাছে ও কখনো মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন হতে পারে না। মুখ দিয়ে যখন কথাটা একবার বেরিয়ে গেছে তখন কাজেও ওকে তা দেখাতে হবে। অবশ্য আসলে ব্যাপারটা অন্য রকম। আপিস সংক্রান্ত যে কাজ রয়েছে তাতে ব্যক্তিগত হাজিরা দেবার কোন কথা নেই। কিন্তু তা আর কি করা যাবে। মিথ্যে বলবে বলে তো আর ও মিথ্যে বলে নি। শুধু লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্যই বলতে হয়েছে। যত বড় সত্যবাদীই হোক মানুষ কখনও কখনও এরকম ক্ষেত্রে মিথ্যে বলতে বাধ্য হয়। আর তা বলতে হয় বলেই হয়তো শাস্ত্রে আত্মরক্ষার্থে মিথ্যে বলার যুক্তি রয়েছে। না, যত কষ্টই হোক বেরুতে ওকে হবেই। এই মুহূর্তেই আর এক্ষুনি। হৃদয়ে যে কথাই লুকানো থাক প্রকাশ্যে অনিতার কাছেই বা দুর্বলতা দেখাবে কেন ও।…খাটের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে খানিক বিশ্রাম করছিল প্রশান্ত, সহসা উঠে দাঁড়ায়। সুটকেস খুলে আনকোরা সুট পরতে থাকে।

অনিতা নিজের ঘরে যাবার আগে আর একবার খোঁজ নিতে আসে। অবশ্য করার কিছু নেই। সব ব্যবস্থাই হয়ে আছে। ভৃত্য রামলোচন এক পায়ে খাড়া আছে। ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে এসে

হাজির হবে। তবু প্রশান্তর মধ্যে যে রকম লাজুকতা দেখেছে ও তাতে খুঁটিয়ে দেখাই সমীচীন। অনিতা পর্দা সরিয়ে মন্থর গতিতে প্রবেশ করে। দু'চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু—স্থলপদ্মের মতো লাল হয়ে উঠেছে। এলো চুলের চূর্ণ চূর্ণ কয়েক গুচ্ছ ললাটের ওপারে লুটাচ্ছে। ডানহাত দিয়ে বড় একটা গুচ্ছ চোখের পাশ থেকে সরিয়ে, থমকে দাঁড়ায় অনিতা। একি, ভদ্রলোক এমন অসময়ে স্যুট পরছেন কেন!

পেছনে দাঁড়িয়েই ভাবছিল অনিতা। কিন্তু ওর মদালস অঙ্গশ্রীর ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় সামনের বড় আয়নায়। সহসা যেন দিনের আকাশেই চাঁদ দেখে প্রশান্ত। হাসি হাসি মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, ঘুমোন নি?

অনিতা সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করে, কোথাও বেরুচ্ছেন কি?

হ্যাঁ, জেনারেল পোস্ট অফিসে যেতে হবে একবার?

বিশ্রাম না করেই?

সময় কোথায় বলুন? কালকেই যে আমাকে লক্ষ্ণৌ ফিরতে হচ্ছে।

কালকেই!

হ্যাঁ, তাই তো ঠিক আছে।

কিন্তু আপনার মাস্টার মশাই বলছিলেন, আপনি দিনকয়েক এখানে থাকবেন।

মাস্টার মশাই বলছিলেন!

উনি বলবেন না তো কে বলবে?—অনিতার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

বেশ, ওঁকে আমি বুঝিয়ে বলব, কৃত্রিম ঔদাসীন্য ঝরে পড়ে প্রশান্তর কণ্ঠে।

অনিতা বলে, সে যা হয় বলবেন। কিন্তু এখন আপনার বেরুনো হবে না।

বারে, তা কি করে হয়!

খুব হয়। আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি চললুম।—সহসা হাজির হয়েছিল অনিতা সহসাই আবার পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে যায়।

প্রশান্ত আর কোন জবাব দেবার ফুরসত পায় না। হাঁ করে ওর পথের দিকে চেয়ে থাকে কেবল। যেন একশ চুয়াল্লিশ' ধারা জারি করেই চলে গেল ও। নিরুপায় প্রশান্ত, একান্ত অনুগত প্রজার মতোই স্যুট খুলতে থাকে। মনের ময়ূরটা নাচ শুরু করে দেয়। বেরুবার আর স্পৃহা থাকে না। আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। হয়ত বা ঘুমিয়েই পড়ে।

## ছয়

দুপুরে প্রশান্ত সকলের সঙ্গে গতানুগতিক রান্নাই খেয়েছে। শ্রীমতী দাশগুপ্ত এ নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। দৈনিকের এই সামান্য রান্না কি করে একজন অতিথিকে দেওয়া যায়!...কিন্তু ডক্টর দাশগুপ্ত সে কথায় কান দেন না। প্রশান্ত আবার অতিথি কেমন করে হয়। ছাত্র—সে তো ছেলেরই সামিল। ঘরের ছেলের খাওয়া নিয়ে মানুষ আবার এত বাচ-বিচার করে নাকি! সারারাত গাড়ি-ঘোড়া দৌড়ে এসেছে। যা হোক কিছু মুখে দিয়ে একটু ঘুমোতে পারলেই সুস্থ হবে।...

শ্রীমতী দাশগুপ্ত এর পর আর আপত্তি করতে পারেন নি। অতি সাধারণ রান্না দিয়েই ঘরের ছেলেকে খাইয়েছেন। কিন্তু বৈকালিক জলযোগের বেলায় আর তা হতে দেন না। দুপুরে ঘুমোনো ওঁর বরাবরের অভ্যাস। আজও একটু না গড়িয়ে পারেন নি। কিন্তু অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ অনেকটা আগেই ঘুম থেকে ওঠেন। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতেই একরাশ খাবার তৈরি করে ফেলেন। অনিতা বিন্দুমাত্র টের পায় না। সেই থেকে অসাড়ে

ঘুমোচ্ছে। লিলি ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে ওর ঘুম ভাঙায়। লজ্জাই পায় বেচারা কাকীমার কাছে। কিন্তু শ্রীমতী দাশগুপ্ত এতটুকু ক্ষুণ্ণ হন নি। উনি ওদের দু'বোনকে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পালটে নিয়ে টেবিল সাজাতে নির্দেশ দেন।

প্রশান্তকে আর হাঁক-ডাক করতে হয় না। বেশ এক চোট ঘুম হয়েছে ওর। তবু সময়মতোই জেগেছে। লিলি ফিরে আসার কিছুক্ষণ আগেই। বসে বসে এতক্ষণ একটা বই পড়ছিল। কিন্তু লিলির তাড়ায় বেশীদূর এগুতে পারে না। বই বন্ধ করে বাথরুমে যেতে হয়। হাত-মুখ ধুয়ে যথারীতি ফিরে আসে প্রশান্ত। সকালে সমস্ত মুখখানায় কেমন যেন কালি ঢেলে দিয়েছিল। এখন বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সকলের সঙ্গে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে। ওর পাশাপাশি বসেন ডক্টর দাশগুপ্ত। মুখোমুখি বসে লিলি ও অনিতা। শ্রীমতী দাশগুপ্ত একপাশে একলাটিই বসেন। আর একদিক খালি থাকে। অতিরিক্ত কোন কিছু দরকার হলে হুকুমমতো রামলোচন এদিক দিয়েই পরিবেশন করবে।

সকলে মিলে একত্র বসে খাওয়া—বেশ লাগে প্রশান্তর। আয়োজনের মধ্যে রয়েছে বেশ একটা ছিমছাম ভাব। কোথাও কোন আতিশয্যের বালাই নেই। আবার পেট ভরবার মতো জিনিসেরও অভাব নেই। আর যাই হোক ভোজন-বিলাসিতা একে কিছুতেই বলা যায় না। সব জিনিসই নিজেদের ঘরে তৈরি। সব চেয়ে কম খরচায় সবচেয়ে বেশী ভোগ সুখের ব্যবস্থা। প্রশান্ত যত দেখছে ততই যেন অভিভূত হয়ে পড়ছে। ওর মা-বাবাকে নিয়েও গর্ব করা যায়। লোকে আদর্শ দম্পতী বলেই সম্মান করে ওঁদের। কিন্তু তা হলেও পরিবারের সকলের সঙ্গে সকলের মেলামেশায় এরকম নিবিড়তা নেই। কেমন যেন সম্ভ্রমপূর্ণ ছককাটা ব্যবস্থা। শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ মমতার এতটুকু ত্রুটি নেই। তবু নেই এ রকম সহজ সরল মেলামেশার সুযোগ। মা-মাণ তো বাবার সামনে বসে কিছুতেই খাবেন না।

ওতে নাকি গুরুজনের সম্ভ্রমের হানি হয়। কিন্তু তা কেন হবে! গুরুজন কি শুধুই গুরুজন। প্রিয়জন কি তিনি নন!···ভাবতে ভাবতে প্রশান্ত মুখ বন্ধ করে খানিক বসে থাকে। শ্রীমতী দাশগুপ্তর সঙ্গে সহসা চোখোচোখি হয়ে যায়। সস্নেহেই উনি অভিযোগ করেন, তুমি কিন্তু কিছুই খাচ্ছ না প্রশান্ত।

প্রশান্ত লজ্জায় পড়ে। মুখে কোন উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা কচুরি তুলে নিয়ে মুখে দিতে যায়।

ডক্টর দাশগুপ্ত রসিক মানুষ। নিজের প্লেটটি প্রায় সাবাড় করে সামনে রাখা বড় প্লেট থেকে আরও খানকয়েক কচুরি নিজের প্লেটে তুলে নিতে নিতে প্রশান্তকে উৎসাহিত করেন, চিয়ার আপ মাই বয়। খাওয়ার ব্যাপারে কখনও পেছিয়ে পড়তে নেই। ফলো মি প্লিজ।···

রকম দেখে লিলি চোখ তুলে এক ঝলক তাকায় মাত্র।

ইঙ্গিতেই ডক্টর দাশগুপ্ত বোঝেন, তাঁর ওপর ওয়ার্নিং পড়ছে। সুতরাং আর বেশী বাড়াবাড়ি না করে মাত্র দু'খানা কচুরি নিয়েই ক্ষান্ত থাকেন।

ব্যাপার দেখে অনিতার ঠোঁটে কিঞ্চিৎ হাসি খেলে। প্রশান্তর ঠোঁটেও তার রেশ লাগে।

বেশ একটা মিষ্টি পরিবেশের মধ্যে বৈকালিক চা পর্ব শেষ হয়ে আসে। শ্রীমতী দাশগুপ্ত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রশান্তকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন, এর আগে কখনো এখানে বেড়াতে আস নি?

প্রশান্ত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই উত্তর করে, সে না আসার মতোই। খুব ছোটবেলায় একবার মা-বাবার সঙ্গে এসেছিলাম। এখানকার পথঘাট কিছুই মনে নেই।

আই সি, তাহলে তো এখানকার গলি-ঘিঞ্জিতে খুবই মুশকিলে পড়বে। লিলি, অনু, তোমরা দু'জনেই তাহলে ওকে সঙ্গে করে খানিক বেড়িয়ে এসো, শ্রীমতী দাশগুপ্ত প্রশান্তর কথায় সায় দিয়ে লিলি অনিতার উদ্দেশ্যে কথা পাড়েন।

সেই ভাল। আমাকে আবার এক্ষুনি একটা জরুরী কাজে বেরুতে হবে, শ্রীমতী দাশগুপ্তকে সমর্থন করেন ডক্টর দাশগুপ্ত।

প্রস্তাবে প্রশান্ত মনে মনে আশাতীত খুশী হয়। পথেঘাটে এর চেয়ে ভাল গাইড আর কি হতে পারে! তবু লজ্জা কাটাতে ওদের দু'জনের প্রস্তাবেই বাধা দিতে যায়। কিন্তু সুযোগ পায় না। লিলি ওর আগেই নিজের অক্ষমতা জানায়, একস্‌কিউজ মি মিষ্টার সেন। আজকে অনিদির সঙ্গেই ঘুরে আসুন। কাশীর পথঘাট ওর নখ-দর্পণে, আপনার কোন অসুবিধে হবে না। আমাকেও এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে। মীরাদির জন্মদিন আজ, না গেলে রাগ করবেন।

ঠিক বলেছিস, আমার খেয়ালই ছিল না। মীরা তো দুপুরেও একবার এসেছিল। তোকেই নাকি ওপেনিং সঙ্‌ গাইতে হবে। প্রশান্ত, সেই ভাল। তুমি অনুকে সঙ্গে করেই খানিক ঘুরে এসো, লিলিকে সমর্থন করে প্রশান্তকে উৎসাহিত করেন শ্রীমতী দাশগুপ্ত।

প্রশান্তর মনে খুশীর বান ডাকে। বুঝতে পারে না, ওর মনোভাব ওঁরা সকলে বুঝতে পেরেছেন কি না! হয়তো…না না, একি দুর্বলতা! ওঁরা তো ঘরের ছেলে মনে করেই মেলামেশার সুযোগ দিচ্ছেন। এতে আবার ভাববার কি আছে! আপত্তি যদি করতে হয় অনিতা আপত্তি করুক। ইচ্ছে করলেই ও লিলির মতো পাশ কাটাতে পারে। আমার অত ভাববার কি আছে।

কিন্তু প্রশান্ত হাজারবার চেষ্টা করেও লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারে না। শ্রীমতী দাশগুপ্তকে লক্ষ্য করে আমতা-আমতা করেই বলতে থাকে, না—মানে মিস দাশগুপ্তর যদি অসুবিধে হয় তাহলে আমি একাও একটা এক্কা করে ইউনিভার্সিটির দিকটা ঘুরে আসতে পারি।…

ওর আবার অসুবিধে কি হে। আর ইউনিভার্সিটিই যদি দেখবে তাহলে তো আমাদের দু'জনের একজনকে সঙ্গে যেতেই হয়। অবশ্য গাইড হিসেবে অনুই আমার চেয়ে ভাল হবে। স্টাফের সকলেই ওকে খুব স্নেহ করেন। অনু, মিস্টার শুক্লাকে বলিস, প্রশান্তকে যেন

আমাদের লাইব্রেরীটা ভাল করে দেখিয়ে দেন। প্রশান্ত, আর দেরি করো না। সাতটার পরে কিন্তু কিছুই খোলা পাবে না। চটপট বেরিয়ে পড়ো। ডক্টর দাশগুপ্ত খোলা মনেই ওদের দু'জনকে উৎসাহিত করেন।

প্রশান্ত আর আপত্তি করতে পারে না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই উভয়ে বেরিয়ে পড়ে। লিলি সদর পর্যন্ত ওদের দু'জনকে এগিয়ে দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে নিজের ঘরে ফিরে আসে। ওকেও এক্ষুনি মীরার বাসায় রওনা হতে হবে।

## সাত

বারাণসীর ইউনিভার্সিটি অঞ্চল। শহরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ স্থান। ধর্মানুরাগীরা হয়তো বাবা বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য কীর্তনেই খুশী থাকেন। কিন্তু অন্যান্য ভ্রমণকারীর পক্ষে ইউনিভার্সিটিই অধিকতর আকর্ষণীয়। একাধারে শিক্ষা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। তাই কাশী ভ্রমণে এসে কেউ এ স্থানটি না দেখে ফেরেন না। প্রশান্ত শুধু সৌন্দর্যের উপাসকই নয়। বিদ্যা তথা জ্ঞানার্জনেও ওর উৎসাহ প্রবল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও। সমস্ত ভারত কেন পৃথিবীর মধ্যেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান উল্লেখযোগ্য। তবু কাশীর হিন্দু ইউনিভার্সিটির ওপর প্রশান্তর সুগভীর শ্রদ্ধা আছে। ছাত্রাবস্থায়ই ও বহুবার বহু কারণে হিন্দু ইউনিভার্সিটির ওপর আকৃষ্ট ছিল। বহুবার মনে করেছে সেখানে গিয়ে দেখে আসে নবতর শিক্ষার রীতিনীতি। ভারতের একজন আদর্শ কর্মী নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন এই বিরাট শিক্ষাশালা। কিন্তু মনের ইচ্ছা কোনদিনই কার্যকরী হতে পারে নি। স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। তা হোক। মানুষ জীবনে অনেক স্বপ্নই দেখে। কিন্তু ক'টা

আর বাস্তবে রূপ পায়। আজ যে চাকরি ও করছে তা হয়তো এ বেকারের দেশে অনেকের কাছেই পরম লোভনীয়। কিন্তু ওর স্বপ্ন তো ছিল আরও উঁচু আরও মহৎ। ঐতিহাসিক সাধনাই করতে চেয়েছিল ও। কিন্তু ভাগ্যচক্রে সফলকাম হতে পারে নি। এতে কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। তাছাড়া শিক্ষা তো শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ ইচ্ছা করলে আজীবন শিক্ষার মধ্যে ডুবে থাকতে পারে। সাধ্যমতো সেই চেষ্টাই করে আসছে ও। চাকরির নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কখনও আর তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সময় পেলেই দেশ-বিদেশের অমূল্য গ্রন্থরাজীর মধ্যে ডুবে থাকে। অন্তরের প্রেরণায় কখনও কিছু কিছু লিখেও থাকে। শাশ্বত কীর্তি লাভের মতো হয়তো এখনও দেশকে কিছু দিতে পারে নি। কিন্তু ক্ষতি কি তাতে। মানুষ আমৃত্যু তপস্যা করে যাবে। আর মহাকাল নির্মম হস্তে বিচার করবে। তা করুক, মরুভূমির অনন্ত কোটি বালুকণার মধ্যে দু'একটিই মরুদ্যান থাকে। তেমনি হাজার সাধকের মধ্যেও দু'একটির ভাগ্যেই কালজয়ী বরমাল্য জুটবে। কিন্তু মানুষ তো তাই বলে নিশ্চেষ্ট থাকবে না। ভাগ্যের আকাশে পাল তুলে পাড়ি জমাবার চেষ্টা সে করবেই।...এক্কার গতি বেড়ে চলেছে। পাশে রয়েছে তরুণী ভ্রমণ-সঙ্গিনী—সুন্দর সুষমামণ্ডিত। ঝাঁকুনিতে ঝাঁকুনিতে ওর গায়ের সঙ্গে গা লেগে যাচ্ছে ওর। কিন্তু প্রশান্তর কোন হুঁশ নেই। কেমন করে যেন বিরাট কর্ম-যজ্ঞের মাঝে নিজকে হারিয়ে বসে আছে। এ যেন সেই শ্রীকৃষ্ণের রথ চলেছে। শ্রীবৃন্দাবন থেকে কর্মক্ষেত্র মথুরায়। গোপিনীরা পথ রোধ করে দাঁড়িয়েও তার গতি রোধ করতে পারছে না। সরে যাও নয়তো তলায় পড়ে পিষ্ট হয়ে মরবে।...

ভ্রমণ-সঙ্গিনী দেখে দেখে হতবাক্ই হয়। ও কি একটি কাঠের পুতুলের পাশে বসে পথ চলেছে! আগে জানলে কে আসতো এমন মানুষের সঙ্গে!...বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নেয় অনিতা। কিন্তু

বেশীক্ষণ রেশ রাখতে পারে না। খানিক যেতে না যেতেই আবার মুখ ঘুরিয়ে চোখে চোখ রাখতে চেষ্টা করে। বেটাছেলে হয়ে আগে মুখ না খুললে ও আগে কি করে মুখ খোলে!...না, প্রশান্তর তবু কোন সাড়া-শব্দ নেই। লক্ষ্যবিহীন দৃষ্টি তুলেই চেয়ে আছে পথের দিকে। পথই যেন ওর গাইড—ওকে সঙ্গসুখ দেবে।...অনিতা বিরক্তিতে আবার মুখ ঘুরিয়ে নেয়।...

সন্ধ্যা ছ'টার কাছাকাছি গাড়ি ইউনিভার্সিটির সদরে এসে লাগে। এতক্ষণ পরে হয়তো প্রশান্তর চেতনা ফিরে আসে। কিছুটা লজ্জাই পায়। তাড়াতাড়ি অনিতার কাছে হালকা হতে চেষ্টা করে। মুখ ঘুরিয়ে সহাস্যেই শুধোয়, আমরা এসে গেছি বোধ হয়?

জী হ্যাঁ, এইটেই ইউনিভার্সিটি। অনিতা গুরুগম্ভীর ভাবে জবাব দেয়।

বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত নেমে পড়ে। মনিব্যাগ খুলে তাড়াতাড়ি ভাড়া মিটিয়ে দিতে যায়। কিন্তু অনিতা ওর আগেই নিজের ব্যাগ খুলে ভাড়া দিয়ে দেয়।

প্রশান্ত নিজের ব্যাগ বন্ধ করতে করতে হাসি-ভরা কণ্ঠে শুধোয়, এটা কি ভাল হলো?

অনিতাও হেসে হেসেই উত্তর দেয়, ভাল মন্দ জানিনে জাহাঁপনা। তবে আপনার মাস্টার মশায়ের এই নির্দেশ।

প্রশান্তর মুখে যেন এবার খই ফোটে। আর একটু মাত্রা চড়িয়ে আবার প্রশ্ন করে, আপনারা সকলেই তাহলে আমাকে অতিথি ভাবছেন তো?

প্রশান্তর মুখরতায় অনিতা বিস্মিত হয়। এমন বাক্যবাগীশ এতক্ষণ কি করে গাড়িতে মুখ বুজে ছিলেন! বিস্ময়ের সঙ্গেই পালটা প্রশ্ন করে, তার মানে?

মানে অতি সহজ। অতিথি—মানে যিনি একটি তিথির বেশী

অবস্থান করেন না। পরোক্ষে আমার ওপর বারে বারে সেই নোটিশই জারী করছেন কিন্তু!

অনিতাও মুখর হয়েই জবাব দেয়, মহাশয়ের অনুমান বিলক্ষণ নির্ভুল। শুনেছি, ব্রহ্মার ষাট হাজার বছরে একটি মুহূর্ত। সুতরাং একটি তিথির বেশী ধরে রাখার বাসনা কি করা যায়! জন্ম জন্ম কেটে যাবে যে ঐ একটি তিথিতেই।

প্রশান্ত সহসা এর আর কোন জবাব খুঁজে পায় না। তাই হালকা কথা হালকাভাবেই উড়িয়ে দিতে যায়, মহাশয়ার দেখছি শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি।

হিংসে হচ্ছে বুঝি?—অনিতার ঠোঁটে চপল হাসি।

হিংসে কেন অনেক কিছুই হচ্ছে। তবে—

তবে ভাবনা পরিহার করে অগ্রসর হোন আর্য। বিলম্বে হতাশ হবার সম্ভাবনা।

অধমকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন ভদ্রে।

খুব যে কথা ফুটছে—গাড়িতে কি হয়েছিল?

কই, কিছুই তো হয় নি! গাইড মুখ না খুললে আগন্তুক কি করে মুখ খোলে?

তা হলে এখনও আর খুলে কাজ নেই তাড়াতাড়ি অনুসরণ করুন।

তথাস্তু দেবী।

মনের কোণে একফালি মেঘ জমেছিল অনিতার, প্রশান্তর সরসতায় মুহূর্তে গলে জল হয়ে যায়। প্রাণ প্রাচুর্যেই দু'জনে ইউনিভার্সিটির দিকে এগিয়ে চলে।

সময়ের তাড়া থাকলেও অনিতার সাহচর্যে প্রশান্ত বেশ ভালভাবেই সব কিছু দেখার সুযোগ পায়। ওর বহুদিনের স্বপ্ন আজ সার্থক হলো। সত্যি, কাশীর এই কেন্দ্রটি দেখবার মতোই। খ্যাতিতে

কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয় বড় হলেও এখানকার হিন্দু ইউনিভার্সিটি ঘর-দোরে অনেক বেশী গুছানো। কলকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের মতো নানা জায়গায় ছড়ানো নয় এর বিভিন্ন বিভাগ। প্রায় সব কিছুরই একত্র সমাবেশ। কাজের অনেক সুবিধা হয় এতে। ছাত্ররাও পরস্পর মেলামেশার সুযোগ পায়। কিছু কিছু নতুন বিধিব্যবস্থাও সংযোজিত হয়েছে। প্রশান্ত দেখে খুবই খুশী হয়। মিস্টার শুক্লা খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে লাইব্রেরীটি দেখান। তাছাড়া প্রশান্তর মতো দর্শককে শুধু দেখিয়ে শুনিয়েই ছেড়ে দেন না। চা পানের জন্য বাসায় আমন্ত্রণ জানান। ইউনিভার্সিটির সংলগ্ন কোয়ার্টার। প্রশান্ত ভদ্রতাসূচক আপত্তি জানিয়েও রেহাই পায় না। মিস্টার শুক্লা অনিতাকে সঙ্গে করে ওকে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে আসেন। সময় খুবই কম। সামান্য এক পেয়ালা করে চা ও দু'খানা করে বিস্কুট মাত্র। কিন্তু সামান্য আয়োজনের মধ্যেই মিস্টার শুক্লার আন্তরিকতা ঝরে পড়ে। খুব ভাল বাংলা জানেন উনি। রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর বেশ দখল আছে। প্রশান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে আশাতীত খুশী হয়। কথায় কথায় প্রশান্তকে ধরে ফেলেন মিস্টার শুক্লা। ওর লেখা প্রবন্ধ আর গল্প নাকি উনি নানা পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন। খুব ভাল লেগেছে ওর। কিন্তু অনেক দিন কেন ওর লেখা আর কোথাও দেখতে পারছেন না তা নিয়েও মৃদু অভিযোগ করেন। ডক্টর দাশগুপ্ত ওর গুরু হয়েও এ বিষয়ে যত না ওয়াকিবহাল মিস্টার শুক্লা তার চেয়েও বেশী ওয়াকিবহাল। অনিতারও প্রশান্তর এ গুণটির কথা জানা ছিল না। মিস্টার শুক্লার বিশ্লেষণে বিস্ময় বোধ করে ও। আশ্চর্য মানুষ যা হোক! সেদিনের ট্রেন ভ্রমণ থেকে শুরু করে আজকের এই সান্ধ্য-ভ্রমণ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটিবারও নিজেকে জাহির করেন নি। প্রশান্ত ছাড়া জনকয়েক সাহিত্যিকের সঙ্গে ওর বিলক্ষণ পরিচয় আছে। কিন্তু তাঁরা তো সুযোগ পেলেই আত্ম-প্রশংসায় মেতে ওঠেন। কই এরকম চাপা মানুষ তো আর একটিও

দেখে নিও! মিস্টার শুক্লার মতো লোক যাঁর প্রশংসা করেছেন তিনি কখনও নগণ্য হতে পারেন না। প্রশান্তর ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় অনিতার। শ্রদ্ধার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অভিমানও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তা হলে প্রশান্তবাবু কিছুতেই আমাদের আপনার ভাবতে পারছেন না!…

দেখতে দেখতে ঘড়িতে আটটা বেজে যায়। ওঠবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে অনিতা। আর একদিনের আমন্ত্রণ জানিয়ে খুশী মনেই বিদায় দেন মিস্টার শুক্লা।

প্রশান্ত অনিতা দু'জনেই ওঁকে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

মিস্টার শুক্লা ওদের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যান।

ওঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্ত অনিতাকে লক্ষ্য করে রসিকতা জোড়ে, এর পর দেবী?

অনিতার হাসি পেলেও গম্ভীরভাবেই উত্তর দেয়, সোজা এক্কায় উঠে বাড়ি।

সোজা বাড়ি! এমন চাঁদনী রাত—আর কোথাও কিছু দেখার নেই!

আজ্ঞে না, আমার ভাল লাগছে না।

কিন্তু আমার তো বেশ লাগছে—

কথা শেষ করতে পারে না প্রশান্ত মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে অনিতা বাধা দেয়, আপনার ভাল লাগছে আপনি যত খুশি বেড়াতে পারেন। আমাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে।

নবাগতকে অচেনা পথে ছেড়ে দেওয়া কি গাইডের পক্ষে উচিত হবে? —প্রশান্ত হালকাভাবেই আবার প্রশ্ন করে।

উচিত অনুচিত আমি ভাবতে পারছিনে। তাছাড়া আমি কারও গাইড হতে চাইনে।

হঠাৎ বৈরাগ্যের কারণ?

কারণ অতি সোজা। আপনি যখন আমাদের এড়িয়ে চলতেই চান তখন সে সুযোগ আপনাকে দেওয়া আমাদের উচিত।

দোহাই দেবী রক্ষা করুন। জানি, দেবী পুরাণে আপনাদের অনেক মাহাত্ম্যেরই বর্ণনা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অধম কিছুই বুঝতে পারছে না। দয়া করে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করুন।...

প্রশান্তর চটুলতায় অনিতার পক্ষে হাসি চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে। তবু নিজেকে যথাসাধ্য সংযত রেখে গম্ভীর হয়েই উত্তর দেয়, বুঝতে আপনি ঠিকই পারছেন। কেবল ভান ছাড়ছেন না। আর তা না হবেই বা কেন? সাহিত্যিকদের ধর্মই তো তাই।

বুঝেছি দেবী, ক্ষান্ত হোন। আপনাদের কাছে আমার সাহিত্যিক পরিচয়টা দিই নি—এই তো অভিযোগ? কিন্তু সত্যি বলছি, গর্ব করবার মতো কোন সৃষ্টি আমার নেই। মিস্টার শুক্লা অতিথির মান বাড়াবার জন্যই ওরকম বলছিলেন।

হয়েছে, আর ন্যাকামো করতে হবে না। মিস্টার শুক্লাকে আমরা বিলক্ষণ জানি। অনর্থক তোষামোদ করবার মতো লোক উনি নন। —অনিতা আবার ঝংকার দিয়ে ওঠে।

বেশ তো, তাই যদি মনে করেন তাহলে চলুন না, ওদিকটায় একটু নিরিবিলিতে বসে সাহিত্যচর্চা করা যাক।

এড়াবার মতো এবার আর কোন যুক্তি খুঁজে পায় না অনিতা। চটুল হাস্যে প্রশান্তর মুখের দিকে খানিক চেয়ে থাকে।

প্রশান্তর উৎসাহ বেড়ে যায়। সুযোগ বুঝে আবার তাড়া দেয়, চলুন না, ঐ গাছটার নীচে গিয়ে বসি।

দেরি হয়ে যাবে নাকি?

এই দেখুন, আমি জানি, সাহিত্যিকদের সুযোগ দিতে কেউ আপনারা রাজী নন। —টিপ্পনী কাটে প্রশান্ত।

সমতা রেখে অনিতা পালটা জবাব দেয়, কেন, ঘরে বসে সাহিত্য-চর্চা হয় না বুঝি?

হয়, তবে,—

তবে কি ?

*এই দেখুন, আপনিই কিন্তু কথায় কথায় দেরি করে দিচ্ছেন।* আমার কোন দোষ নেই।

আচ্ছা হয়েছে, চলুন কোথায় যেতে হবে।

প্রশান্ত আর কথা বাড়ায় না। মনের খুশীতে পাশাপাশি এগিয়ে যায় হু'জনে। বেশ ফাঁকা থাকে এ সময়ে এ অঞ্চলটা। শরতের প্রথম প্রহর চলেছে। আকাশে এখন আর তেমন মেঘ নেই। পেঁজা তুলোর মতো টুকরো টুকরো সাদা মেঘের গুচ্ছ অনেক উঁচুতে কোথাও কোথাও ভেসে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টি হবার কোন লক্ষণই নেই। পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে। একাদশীর চাঁদ—উজ্জ্বল মনোলোভা। একটা ঝাউগাছের তলায় ওরা হু'জনে পাশাপাশি এসে বসে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে চারদিক।

অনিতা চাঁদের দিকেই চেয়ে আছে হয়তো। কিন্তু প্রশান্ত চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। না, এতটুকু সংকোচ নেই প্রশান্তর। একটি তরুণ তার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়েই দেখছে আর একটি তরুণীকে। হু'জনেই মন্ত্রমুগ্ধ—স্তব্ধবাক্। কিন্তু তরুণীর পক্ষে বেশীক্ষণ রেশ রাখা সম্ভবপর হয় না। আনত চোখেই প্রশান্তকে লক্ষ্য করে তাড়া দেয়, কই, শুরু করুন।

কি শুরু করবো ? —মোহগ্রস্তের মতোই উত্তর করে প্রশান্ত।

বারে, এই যে বললেন, সাহিত্যচর্চা করবেন !

তাই বলছিলাম বুঝি ?

খুব ভুলো মন তো আপনার, হু'চোখ বিস্ফারিত করেই জবাব দেয় অনিতা।

প্রশান্ত সে কথার কোন জবাব না দিয়ে আপন ঢঙেই বলতে থাকে, কিন্তু কি জানেন, সাহিত্যিক না হয়ে এ সময়ে আমার চিত্রশিল্পী হওয়া উচিত ছিল।

কি করতেন তাহলে? আকাশের চাঁদকে তুলিতে ধরে রাখতেন বুঝি?

হেসে প্রশান্ত বলে, আকাশের চাঁদকে নয়—মাটির চন্দ্রমুখীকে।

*লজ্জায় অনিতার মুখখানা রক্তিম হয়ে ওঠে।* কিন্তু এতটুকু রাগ হয় না ওর। মনে মনে বরং গর্বই অনুভব করে। প্রশান্তর ভাবাবেগের জবাব ভাবাবেগের সঙ্গেই দেয়, এটা কি সাহিত্যের বিন্যাসই হলো না আর্যপুত্র?

হয় তো হবে।

হয়তো নয়—ঠিক তাই। কিন্তু শিল্পী তো ভাব-তন্ময়—নির্বাক্। সাহিত্যিকের প্রেরণাই তাকে বাগ্ময় করে তোলে।

আমি কিন্তু বাগ্ময় হতে চাইনে। ধ্যানের মূর্তির মধ্যেই ডুবে থাকতে চাই।

বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

হোক না, ক্ষতি কি?

আচ্ছা, এখন উঠুন। রাত অনেক হলো। সকলে হয়তো ভাবছেন।

তা হয়তো ভাবছেন। কিন্তু খারাপ কিছু নয় নিশ্চয়, কথা শেষ করে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে প্রশান্ত।

বাপরে বাপ, কথার একবারে ধনী! আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে একজন মৌলিক সাহিত্যিক।—প্রত্যুত্তরে অনিতাও হাসতে থাকে।

দিচ্ছেন তো—তবেই হলো। চলুন তাহলে।

কথায় কথায় দু'জনেই আবার উঠে দাঁড়ায়। একটা এক্কা ঠিক করে আবার পাশাপাশি চলতে থাকে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঝাঁকুনিতে গায়ে গা লাগে পরস্পরের। নবতর দোলা লাগে হিয়ায় হিয়ায়।

## আট

কাশীতে মাত্র একদিন থাকার কথা ছিল প্রশান্তর। শুধু একবার অনিতাদের সঙ্গে দেখা করা ও ওদের জামা-কাপড়গুলো ফিরিয়ে দেওয়া। অন্তরে যাই থাক বাইরে এর বেশী ও আর কিছু ভাবতে পারে নি। কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিনের পরিবর্তে তিনদিন তিনরাত্রি পার হয়ে গেল। হয়তো সাত দিনও এমনিভাবে থাকা যায়। শুধু চক্ষু লজ্জাই যা প্রকট হয়ে উঠেছে। ভাবলে, আর একটা মুহূর্তও থাকা সমীচীন নয়। এঁরা সকলে ভাবছেন কি। জীবনে এই প্রথম ও আর একটি অনাত্মীয় পরিরারের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছে। প্রেম প্রীতি ভালবাসা দিয়ে হয়তো আজীবনই এঁরা ঘিরে রাখতে চাচ্ছেন। হয়তো ঘরের ছেলেই মনে করছেন। কিন্তু তবু তো সঙ্কোচ দূর হবার নয়। মা-মণি হয়তো রোজই ডাক-পিয়নের পথ চেয়ে বসে থাকেন। কথা ছিল, পৌঁছেই পত্র দেবো। কাশীতে না নামলে কোন ত্রুটিই হতো না। পত্রের পরে হয়তো আরও একখানা পত্র এতদিনে পেয়ে যেতেন। না জানি কত ভাবছেন বেচারা! না, আর একটা মুহূর্তও এখানে নয়। আজকেই রওনা হতে হবে। সামান্য একটা কাজের ভান করে আর কতদিন কাটানো যায়! লোকে বলবে কি! শিক্ষক ছাত্র সম্বন্ধ। ছাত্রজীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সূত্রে ছেদ পড়েছে। মাস্টার মশায় নেহাত ভদ্রলোক তাই মনে রেখেছেন। কিন্তু ওজন রেখে না চললে উনিই বা আর কতদিন সহ্য করবেন। হ্যাঁ, এই বেশ ভাল ব্যবস্থা হলো। আজকেই চলে যাব। এখানে থাকার আরও একটা বিপদ আছে। যদি কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে বসেন, কোন্ অফিসারের সঙ্গে আমার কাজ? এখানকার বড়

বড় প্রায় সব মানুষের সঙ্গেই তো ওঁর হরিহর আত্মা। পোস্ট মাস্টাররাই যে পরিচিত হবেন না তার কি মানে থাকতে পারে? কারও নাম ধরে জিজ্ঞেস করলে তো কোন উত্তরই দিতে পারব না। সামান্য দু'চারখানা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ছাড়া আর কোন পরিচয়ই তো নেই কারও সঙ্গে। আর সেও দপ্তরের কাজ নিয়ে। ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারই নয়।...দুপুরের আহারের পর ঘুম থেকে উঠে চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রশান্ত। এলোমেলো ভাবনা মগজে পাক খেতে থাকে। কেমন যেন সঙ্কোচই হতে থাকে ওর। আলনায় জামা-কাপড় ছড়ানো ছিল এক এক করে সব ভাঁজ করে সুটকেসে পুরতে থাকে। আজ রাত্রের গাড়িতেই লক্ষ্ণৌ রওনা হবে।

জামা-কাপড় গুছোচ্ছিল প্রশান্ত ঘরের দরজা ছিল খোলা। শুধু একটা স্ক্রীনের অন্তরাল। খানিক আগে লিলি অনিতা ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরেছে। হাত-মুখ ধুয়ে লিলি আসে প্রশান্তর খোঁজে। ইচ্ছে, টেবিলে বসার আগে খানিক গল্প করে দু'জনে। অত্যুৎসাহেই স্ক্রীন ঠেলে ঘরে ঢোকে লিলি। কিন্তু মুখে আর হাসি থাকে না। প্রশান্তকে জামা-কাপড় গুছাতে দেখে বিস্মিত হয়। খানিক চুপচাপই দাঁড়িয়ে থাকে। প্রশান্ত নিজের খেয়ালে বিভোর। লিলির উপস্থিতি টের পায় না। কিন্তু লিলি আর দম রাখতে পারে না। দু'পা এগিয়ে গিয়ে বিস্মিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করে, একি হচ্ছে?

অসতর্ক গলার আওয়াজে পাশ ফিরে তাকায় প্রশান্ত। তারপর মাত্রা রেখেই জবাব দেয়, যা হবার তাই হচ্ছে। যেতে যখন হবেই তখন মিছিমিছি মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?

না যেতেও তো হতে পারে। —লিলির ওষ্ঠে হাসি খেলে।

তা কি করে সম্ভব?

ইচ্ছে থাকলেই সম্ভব হয়।

বেকার সমস্যার দিনে অধমকে সংখ্যা বাড়াতে বলছেন?

বেকার হতে বলছিনে মশাই—সকর্মক থাকতেই বলছি

বুঝতে পারছি নে আপনার কথা—খুলে বলুন।

সব কথা কি খুলে বলা যায়,—হাসির মাত্রা বেড়ে যায় লিলির ওষ্ঠে।

কিন্তু প্রশান্ত হাসতে পারে না—। কিছুটা অনুযোগের সুরেই বলে, কি হেঁয়ালি করছেন!

হেঁয়ালি আমি করছি—না আপনি করছেন! পরশু থেকে বলে আসছি, সামনের তিনদিন আমাদের ছুটি। সকলে মিলে চুনার বেড়াতে যাবো। আপনি মৌন থেকে পরোক্ষে সম্মতিই জানিয়েছেন। গোছগাছও আমাদের প্রায় সম্পূর্ণ। হোটেল এ্যাকোমোডেশনও পাওয়া গেছে। এখন পালাতে চেয়ে কি হেঁয়ালিই করছেন না?

প্রশান্ত হাতের কাজ গুছাতে গুছাতেই উত্তর দেয়, মৌনং সম্মতি লক্ষণম্-এর ফর্মুলায় আমাকে ফেলা হয়তো আপনার পক্ষে দোষের নয়। কিন্তু সত্যি বলছি, আর দেরি করার কোন উপায় নেই।

আপনার এ যুক্তিও ধোপে টেকে না।

তার মানে?

মানে অতি স্পষ্ট—হয়ার দেয়ার ইজ উইল দেয়ার ইজ ওয়ে।

বাট দেয়ার ইজ নো ওয়ে ফর মি ম্যাডাম্। দুর্দিনের বাজারে চাকরিটা গেলে ভাতে মরবো যে।

উত্তরে লিলি হয়তো আরও জোরালো যুক্তিই দেখাতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুযোগ পায় না। জলযোগের জন্য সেই মুহূর্তেই ডাক পড়ে। টেবিলে সকলেই বসেছেন। ওরা দু'জনে গেলেই হয়। সুতরাং চলতি প্রসঙ্গ থামিয়ে ওদেরও উঠতে হয়।

আয়োজন সামান্যই—তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—ছিমছাম। খাওয়া অপেক্ষা খাওয়ার আনন্দটাই মুখ্য। সুখী পরিবার। সকলে মিলে একসঙ্গে বসে খায়। তাতে পেট ভরে—সেই সঙ্গে মন।

ডক্টর দাশগুপ্ত কাটলেটের খানিকটা অংশ ছুরি দিয়ে কেটে সবে

মুখে পুরেছেন লিলি আব্দার করে, বাপি, মিস্টার সেন আজকেই চলে যাচ্ছেন।

মুখের ভেতরের খাবারগুলো তাড়াতাড়ি উদরস্থ করে ডক্টর দাশগুপ্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন, সে কি হে, আজকেই যাবে কি! অনু বলছিল, সামনের ছুটিতে তোমরা সকলে মিলে চুনার বেড়াতে যাচ্ছ!

ডক্টর দাশগুপ্তর কথায় অন্তরে বল ফিরে পায় প্রশান্ত। কেন ও যাবার জন্য মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! এঁরা তো আন্তরিকভাবেই আদর-যত্ন করে যাচ্ছেন! তা ছাড়া অনিতা বেড়াতে যেতে চাচ্ছে। এর চেয়ে সুযোগ জীবনে আর কি করে আসতে পারে!…পালে খুশীর হাওয়া লাগে প্রশান্তর। চুনারে এর আগেও বারকয়েক গেছে ও। সমস্ত গিরি-কন্দর মুহূর্তে ভেসে ওঠে চোখের ওপর—রমণীয় হয়ে ওঠে। এই তো সেই নারী যার আবির্ভাব হৃদয়ের মণিকোঠায়। কে সুচরিতা? না, এ নামে কাউকে জানে না ও। ছোটবেলার সুচি খেলার সাথী ছিল বটে। কিন্তু সে তো শুধুই পুতুল খেলা। প্রাণের সংযোগ সেখানে কতটুকু ছিল? না না, অজানা অচেনা কাউকে জীবন-সঙ্গিনী করা বিধাতার বোধ হয় ইচ্ছা নয়। নয়তো চার হাত তো এক হয়েই যাচ্ছিল, বাধা পড়ল কেন! অনিতার সঙ্গেই বা গাড়িতে ওভাবে দেখা হলো কেন!…প্রশান্ত আর ভাবতে পারে না। থেকে যেতেই মনস্থির করে। সেই সঙ্গে চুনার পরিক্রমা। তবু বাহ্যিক আদর না বাড়িয়ে পারে না। আমতা-আমতা করেই ডক্টর দাশগুপ্তর প্রশ্নের জবাব দেয়, ওঁদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারলে খুবই খুশী হতাম স্যার। কিন্তু—

আপনার ও কিন্তু রাখুন। জানলে বাপি, ওঁর ধারণা, ওঁর উপস্থিতিতে আমরা খুব বিব্রত বোধ করছি। তাই উনি আর একটা দিনও থাকতে চান না, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেয় লিলি।

প্রশান্ত খুবই লজ্জায় পড়ে। অনিতার মুখখানাও লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। ডক্টর দাশগুপ্ত লিলিকে সমর্থন করে বলেন, প্রশান্ত,

এ যদি সত্যি হয় তা হলে তো তোমার কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না।

শ্রীমতী দাশগুপ্ত চামচে দিয়ে আর একটা ফ্রাই প্রশান্তর ডিসে পরিবেশন করতে করতে অভিযোগ পেশ করেন, তুমি কিন্তু কিছুতেই আমাদের আপনার ভাবতে পারছ না প্রশান্ত।

লজ্জা ঢাকতে প্রশান্ত তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, না না, তা কেন হবে! তবে আমি বলছিলাম কি—

মানে আপনি কিছুই খুঁজে পাবেন না মিস্টার সেন। সহজ সরল করে যদি আপনার কথার মানে করা হয় তাহলে একথা নিশ্চয় করে বলা যায়, স্বচ্ছন্দে আর ক'টা দিন আপনি কাটাতে পারেন, লিলি আবার নিজের কথায় জোর দেয়।

মনস্তত্ত্বের দর্পণে ধরা পড়ে গেছে যেন প্রশান্ত। লিলিকে প্রতিবাদ করবার মতো সহসা কোন যুক্তি খুঁজে পায় না। মুখ নত করে লজ্জায় মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

অনিতার মুখেও কিঞ্চিৎ হাসির রেখা দেখা দেয়।

সমতা রেখে ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, লুক হিয়ার মাই বয়, তোমার কাজের কোনরকম ক্ষতি হলে অবশ্য আমরা জোর করতে পারি না। নয়তো তোমার উপস্থিতিতে আমরা বিব্রত তো হই-ই নি বরং খুশীই হয়েছি। বিদেশে একজন বাঙালীর কাছে আর একজন বাঙালী যে কি তা বোধ হয় তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। তা ছাড়া তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে। তোমার আবার লজ্জার কি?

লজ্জা ওঁর খানিকটা থাকবেই বাপি। তা আমরা হাজারবার বললেও—চাপল্য রেখেই বলে লিলি।

সাইকোলজির স্টুডেন্ট হিসেবে তা তুই ভাল পারিস মা। সহজ কথাটা আমি সোজাসুজিই বলছি।

সহজ কথা অনেক আগেই সহজ হয়ে গেছে। মিস্টার সেন নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে চুনার যাচ্ছেন। ডক্টর দাশগুপ্তর কথার জবাব

দিয়ে প্রশান্তর দিকে চেয়ে হাসতে থাকে লিলি। অনিতার ঠোঁটেও তার ছোঁয়া লাগে। এতক্ষণ পরে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারল বেচারা।

প্রশান্ত এর পর আর কোনরকম ওজর দেখাতে সাহস করে না। মৌনতার মধ্যে সম্মতিই প্রকাশ পায় ওর।

লিলি প্রশান্তকে ছেড়ে এবার অনিতাকে ধরে, তুমি যে দেখছি দিব্যি ডান হাত চালিয়ে যাচ্ছ! আরম্ভ করো!

বুঝেও যেন কিছুই বোঝে না অনিতা। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বিস্ময় প্রকাশ করে, কি আরম্ভ করবো রে!

লিলি ততোধিক বিস্ময়ের সুরেই পাল্টা প্রশ্ন করে, চায়ের পরে কি চলে জানো না বুঝি?

না ভাই, সত্যি বলছি, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।

ইস, বুঝতে আবার পারছো না! আদর বাড়াতে চাও তো? তা বেশ, এই করজোড়ে অনুরোধ করছি, দেবী—সুধা পরিবেশ করুন।

চা পানের শর্ত তো সে রকম ছিল না আর্যকন্যা।

শর্ত বরাবর তাই আছে এবং এখনও তাই থাকবে—মধুরেণ সমাপয়েৎ। —লিলিকে সমর্থন করে ডক্টর দাশগুপ্ত জবাব দেন।

কিন্তু আমার যে গলাটা তেমন ভাল নেই, অনিতা পাশ কাটাতে চেষ্টা করে।

গলা খুব ভাল আছে দেবী—দয়া করে এখন আরম্ভ করুন, লিলি আবার তাড়া দেয়।

অনিতা আর কথা বাড়ায় না। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে আরম্ভ করে—ওর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের গান।

গান শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার রেশ যেন কানে লেগে থাকে। রবীন্দ্র সংগীত ডক্টর দাশগুপ্তর খুব প্রিয়। অনিতার মুখে যেন কবির

বাণী মরমে প্রবেশ করে। মুখর আসর স্তব্ধ। চপল লিলির মুখেও রা নেই। শ্রীমতী দাশগুপ্তর ওষ্ঠে মৃদু হাসির রেখা।

অনুকে নিয়ে উনি নিশ্চয়ই গর্ব করতে পারেন। প্রশান্ত যেন প্রশান্তর মধ্যে নেই। অনিতা কি ওকে লক্ষ্য করেই এ গানটি গাইলো? ও নিজেও এ গানটি অনেক সময় গুনগুন করে গেয়ে থাকে। কিন্তু অনিতার মুখে যেন মধু ঝরল। এ গান এমনি কণ্ঠেই মানায়। প্রিয় গান প্রিয়তর হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে গায়িকা স্বয়ং। গান থেমে গেছে কিন্তু তার রেশ কর্ণকুহরে অবিরত ঝংকার তুলছে। চোখ তুলে এক ঝলক তাকায় প্রশান্ত অনিতার দিকে। চোখোচোখি হয়ে যায় দু'জনার। লিলির দৃষ্টি এড়ায় না। আবার মুখর হয়ে উঠতে যাচ্ছিল ও। কিন্তু ডক্টর দাশগুপ্ত ওকে সে সুযোগ দেন না। সর্বপ্রথম উনিই মুখ খোলেন। নিমীলিত চোখ উন্মীলিত করে বলেন, বেশ হলো। এবার যাও, তোমরা সকলে মিলে খানিক বেড়িয়ে এসো। আমাকেও এক্ষুনি একবার বেরুতে হচ্ছে।

প্রশান্ত মনে মনে হয়তো এই সুযোগই খুঁজছিল। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় অনিতা। কিন্তু লিলি ওঠে না। বসে থেকে পাশ কাটায়, মিস্টার সেন, আমাকে আজও মাপ করতে হবে। এক্ষুনি আমার এক বান্ধবী এসে পড়বে। আমি আজও আপনাদের সঙ্গে যেতে পারছিনে।

লিলির কথায় অনিতা বিব্রত বোধ করে। কিন্তু প্রশান্ত মনে মনে খুবই খুশী হয়। হ্যাঁ, এই তো চেয়েছিল ও। লিলির রসিকতায় মাধুর্য আছে কিন্তু ওতে প্রাণ ভরে না। প্রাণের অলিগলি জুড়ে বসে আছে অনিতা। হ্যাঁ অনিতা। যাকে একবারটি দেখবার জন্য এমনি কপটতার আশ্রয় নিয়ে এখানে আসতে হয়েছে ওকে। কে জানে, কি থেকে কি হয়ে যায়। অনিতা কি কিছুই বুঝছে না? বুঝছে বই কি। শুধু অনিতা কেন এ বাড়ির সকলেই বেশ বুঝতে পারছেন। লিলি বুঝেই ওদের সুযোগ দিচ্ছে। ···এক নিমেষে

প্রশান্ত সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে জরিপ করে ফেলে। তবু লিলির পাশ কাটাবার অজুহাতে বাহ্যিক প্রতিবাদ না করে পারে না। হালকা-ভাবেই বলে, বান্ধবীকে তো রোজই পাবেন—

শুধু পাব না আপনাকে, কেমন?— মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয় লিলি।

রোজ কি করে পাবেন বলুন?

ইচ্ছে করলেই আপনি আমাদের সুযোগ দিতে পারেন।

ইচ্ছে করলেই পারি?

কেন না? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরি, ইচ্ছে করলেই কি এখানে বদলী হয়ে আসতে পারেন না?

ইচ্ছে করলেই পারিনে, তবে চেষ্টা করতে পারি।

বেশ তো, তাই কর না বাবা। সকলে মিলে একসঙ্গে থাকা যাবে। কাশী জায়গাটা এমন কিছু খারাপ নয়। লক্ষ্ণৌ অপেক্ষা অনেক বেশী বাঙালীর বাস, লিলিকে ডিঙিয়ে শ্রীমতী দাশগুপ্ত অনুরোধ করেন।

উত্তরে প্রশান্ত বলে, আমার অনেক বেশী লোকের প্রয়োজন নেই মাসীমা। শুধু আপনাদের স্নেহ পেলেই ধন্য হবো। লক্ষ্ণৌ পৌঁছেই আমি চেষ্টা করবো।

প্রশান্তর সমর্থনে শ্রীমতী দাশগুপ্তর চোখ-মুখে প্রসন্নতার হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু আর বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ পান না উনি। ডক্টর দাশগুপ্ত বাধা দেন, আচ্ছা, ও নিয়ে এখন গবেষণা করতে হবে না। তোমরা বেরিয়ে পড়ো।

ডক্টর দাশগুপ্তর তাড়ায় বাইরের দিকেই পা বাড়ায় প্রশান্ত। মন খুশীতে ডগমগ। কিন্তু অনিতার সঙ্কোচ কাটে না। আর একবার লিলিকে সাধতে যায়। অনুযোগের সুরেই অনুরোধ করে, চল না ভাই। শান্তা এলে কাকীমা বলে দেবেন'খন।

তা হয় না দেবী, তুমি এসো, উত্তর দিতে দিতে চপল কটাক্ষ

করে লিলি। নীরব ভাষাতেই যেন বোঝাতে চায়, আমি গেলে তোমাদের সুবিধে হবে না।

অনিতা লিলির ভাষা বুঝেও যেন বোঝে না। কৃত্রিম অভিমানই প্রকাশ করে, কি জেদী মেয়ে বাবা। চলুন প্রশান্তবাবু—আর বেশী সাধাসাধি না করে প্রশান্তর সঙ্গে বেরিয়ে যায় অনিতা।

লিলি ওদের সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে।

ওরা চলে গেলে ডক্টর দাশগুপ্তও উঠতে যান। শ্রীমতী দাশগুপ্ত বাধা দিয়ে মন্তব্য করেন, ওদের দু'টিকে কেমন মানিয়েছে দেখলে?

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ডক্টর দাশগুপ্ত ছোট্ট কথায় জবাব দেন, হুঁ।—মুখ হাসি হাসি।

উত্তরে শ্রীমতী দাশগুপ্ত যেন খুশী হতে পারেন না। গাম্ভীর্য নিয়েই আবার বলেন, হুঁ নয়। আমি বলছি, তুমি সোজাসুজি প্রশান্তকে প্রস্তাব করো।

না না, তা কি করে সম্ভব! ওরা দু'জনেই লেখাপড়া শিখেছে। দু'জনেই সাবালক। দু'দিন না হয় মেলামেশা করছে। পরস্পরের যদি পরস্পরকে ভাল লাগে তাহলে ওরা নিজেরাই একদিন আমাদের অনুমতি চাইবে। অনর্থক বাড়াবাড়ি করে লাভ কি।—ডক্টর দাশগুপ্ত কয়েক পা এগুতে এগুতে মন্তব্য করেন।

কি লাভ তা তুমি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে বুঝবে না। মেয়েটার মা নেই। ওর ভালমন্দ আমাকেই দেখতে হবে। প্রশান্তর মতো সৎপাত্র তুমি ক'টি পাবে? —শ্রীমতী দাশগুপ্তর মুখে বিরক্তি প্রকাশ পায়।

ডক্টর দাশগুপ্ত ঘুরে দাঁড়ান। শান্তভাবেই বলেন, আহা-হা, তুমি চটছো কেন? আমি কি অস্বীকার করছি প্রশান্ত ভাল ছেলে নয়?

অস্বীকার করছো না কিন্তু এগুচ্ছই বা কই! —শ্রীমতী দাশগুপ্ত ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন।

ডক্টর দাশগুপ্তর কণ্ঠে এবার রসিকতা ঝরে পড়ে, ধীরে—সজনী—ধীরে।

না না, এ সব ধীরে-সুস্থের ব্যাপার নয়। আমি বলছি, অনুকে প্রশান্তর বেশ ভাল লেগেছে।

বেশ তো, লাগতে দাও না। ভাল লাগা থেকে ভালবাসায় পরিণত হোক—তবেই তো বিয়ে।

কি জানি বাপু, তোমার এসব রসিকতা আমি বুঝি না। যা ভাল বোঝ করো।

এতে আর বোঝাবুঝির কি আছে! ওরা অনুমতি চাইলেই আমরা তা দিয়ে দেবো। তবে ধীরে—সজনী ধীরে, বলতে বলতে শ্রীমতী দাশগুপ্তর চিবুক স্পর্শ করে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন ডক্টর দাশগুপ্ত।

শ্রীমতী দাশগুপ্তও হালকা হন। ডক্টর দাশগুপ্তর হাত সরিয়ে দিয়ে বলেন, সবটাতেই তোমার শুধু হাসি-ঠাট্টা। বয়েস যেন আর হচ্ছে না, বলতে বলতে পাশের ঘরে চলে যান শ্রীমতী দাশগুপ্ত।

ডক্টর দাশগুপ্তও নিচে নামেন।

## নয়

কাশী বোধ হয় প্রশান্তকে জাদুই করেছিল। কলকাতা থেকে রওনা হবার পর আজ এই দশ দিনের দিন লক্ষ্ণৌ পৌঁছল। পথে দু'দিন কেটেছে। বাকী আটদিন অনিতাদের সান্নিধ্যে। কথা ছিল, একবারটি ওদের দেখে, ওদের জামা-কাপড়গুলো ফিরিয়ে দিয়ে বিদায় নেবে। কিন্তু কথা শুধু কথাই রয়ে গেল। এক এক করে কেটে গেছে আটটা দিন। আট দিন কেন আট হাজার বছর কাটলেও বোধ হয় ওর অতৃপ্তি হতো না। চুনার গিরিদুর্গের শীর্ষে সে তো এক স্বপ্ন-মায়া।

নিঝুম পূর্ণিমা রাত। প্রকৃতি যেন পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় হাসছে। নন্দনের শোভাই যেন। দেব-বালারাও পাশেই ছিল। লিলির অপরূপ নৃত্যভঙ্গী—অনিতার সুধাকণ্ঠ।...না না, আট হাজার বছরেও মানুষ সে স্বপ্ন-সুখ ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না।

প্রশান্তর আজও ছুটি। দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তিটুকু দূর করে নিয়ে কাল থেকে শুরু হবে সচল কর্মজীবন। কাল থেকেই কাজে ডুবে যাবার কথা। কিন্তু পারবে কি ও? জীবন-সত্তা তো বাঁধা রয়েছে অনিতার পাশে। অনিতাকে কেন্দ্র করেই জীবনের শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে। অনিতাকে কাছে না পেলে ও হয়তো দম বন্ধ হয়েই মারা যাবে। কিন্তু কোথায় অনিতা? এতো শুধু অতীত সুখের রোমন্থন করা। কস্তুরীমৃগই যেন ও। সুগন্ধে মন উচাটন। কিন্তু নাগালের মধ্যে পাবার উপায় নেই। অনিতাও কি ওরই মতো ভাবছে না?... নিভৃত ঘরে একাকী এলোমেলো ভাবতে থাকে প্রশান্ত। কাশী থেকেই মাকে দু'ছত্র লিখে জানিয়ে দিয়েছে—বিলম্বের কারণ। জরুরী কাজ। আপিসের তদন্ত—অর্ধ-সত্য। কি করবে—মাকে তো আর সবকথা খুলে লেখা যায় না। কিন্তু পৌঁছনোর সংবাদ সময়মতো না দিলে যে বেচারা কেঁদে নাকমুখ ভাসাতেন। এমনিই তো মনে সুখ নেই। কোথায় বরণ করে ভাবী গৃহলক্ষ্মীকে ঘরে তুলবেন আর কোথায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন।...মনের অস্থিরতার মধ্যেও মার জন্য আর একখানি চিঠি কোনরকমে শেষ করে প্রশান্ত। কিন্তু অনিতার চিঠি কিছুতেই শেষ হয় না। গল্প উপন্যাস লেখা পাকা হাতও যেন কাঁচিয়ে যায়। প্রথম পাঠ লিখতেই হাঁপিয়ে ওঠে। কি বলে সম্বোধন করবে অনিতাকে? প্রিয় বান্ধবী—না প্রিয়তমাসু? প্রিয়তমাসু লেখাই তো ঠিক। কিন্তু একি! সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে যে আর একখানা মুখ ভেসে উঠে, চেনা মুখ—সজল মায়াবিনী। সে মুখ সুচরিতার। ছোটবেলার খেলার সাথী—জীবন সাথী হয়েই ঘরে আসছিলেন। কিন্তু কি জানি কেন বাধা পড়ল। আর সেই বাধার মুখেই অনিতার

আবির্ভাব। জানি না, কি খেলা খেলতে চান বিধাতা? অনিতা কি···না না, কিছুতেই ওকে প্রিয়তমাসু সম্ভাষণ করা যায় না। শ্রদ্ধাস্পদেষু। হ্যাঁ, এই তো ভদ্রোচিত সম্ভাষণ।···ইন্দ্র-নীল প্যাডের ওপর খচ্‌খচ্‌ করে লাইন কয়েক লিখে ফেলে প্রশান্ত। মনের সমস্ত আকুলতা যেন একসঙ্গে ঝরে পড়ে কলমের ডগায়। বেশ চলছিল, সহসা আবার থেমে যায়। না, হচ্ছে না। মনের ভাব কিছুতেই প্রকাশ পাচ্ছে না। বিরক্তিতে লেখা কাগজ কুচিকুচি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দেয়। একে একে পাঁচ সাতখানা। না, আজ আর কিছুতেই হয়ে উঠবে না। রাত প্রায় একটা, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না। চোখ, কান, মাথা গরম হয়ে ওঠে। বিছানা ছেড়ে উঠে এসে রেলিংএ দাঁড়ায় প্রশান্ত—আকাশের মুখোমুখি। কৃষ্ণপক্ষের আকাশ মেঘ জমে থমথম করছে। একটিও তারা নেই। সমস্ত শহর নিস্তব্ধ। বিরহী যক্ষের মতোই বুক ভারী হয়ে ওঠে প্রশান্তর। রেলিং ছেড়ে আবার বিছানায় ফিরে আসে। গা এলিয়ে দেয় বিছানায়। কিন্তু ঘুম আসে না।

ঘুম অনিতারও আসে না। লিলি আর ও একঘরে শোয়। লিলি ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘর নিস্তব্ধ। টেবিল ঘড়িতে রাত বারোটা। রোজকার মতো খেয়ে-দেয়ে বই নিয়েই বসেছিল। ঘুমোবে এগারোটায়। লিলি রুটিন মতোই কাজ করেছে—ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ওর চোখে ঘুম নেই। টেবিলের ওপর বই খোলা রয়েছে, মন উড়ে গেছে চুনারের গিরিদুর্গে। পাহাড়ের চূড়ায়। ও আর প্রশান্ত। প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার সে এক বিচিত্র খেলা। জন্মজন্মের সাথী যেন ওরা। প্রশান্ত আজ পাশে নেই। কিন্তু মন তো ওরই পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু'দিন দু'রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে কেবল ভেবেছে। কিন্তু আজ আর শুধু কল্পনার জাল-বোনা নয়। আজকের ডাকেই প্রশান্তর চিঠি এসেছে। ইউনিভার্সিটিতে

বেরুবার মুখে শুধু একবারটি চোখ বুলোবার অবকাশ মিলেছিল মাত্র। ফাঁকে ফাঁকে আরও হু'চারবার পড়েছে, কিন্তু আশা মেটে নি। তাই রাত জেগে এই নিভৃত অভিসার। হৃদয়ের অনুভূতি দিয়েই প্রশান্তর চিঠির মর্মার্থ বুঝতে চেষ্টা করে অনিতা। শুধু চিঠির মর্মার্থ ই নয়— চিঠির মালিকেরও।...

একবার—হুবার—তিনবার চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে যায় অনিতা। খুশীতে মন ভরে ওঠে। ঠোঁটের কোণে হাসি। হ্যাঁ, প্রশান্ত তো ওকে ধরা দিয়েছেই। এ চিঠির মর্মার্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে। খুব সাদাসিধে লেখা। কিন্তু এই সাদাসিধের মধ্যেই আসল রূপ ফুটে উঠেছে। প্রজাপতির পাখার মতোই তা মনোমুগ্ধকর। ...আনন্দের আতিশয্যে বুকের মধ্যে চিঠিখানা চেপে ধরে অনিতা। বাতি নিভিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে স্বপ্ন-মায়ায় জড়িয়ে যায়। সে এক রূপকথার দেশ। গাছে গাছে হীরার ফল, সোনার ফুল। হুধ সরোবরে নেয়ে উঠল ওরা। ঝলমলে পোষাকে সাজিয়ে দিলে দেব-বালারা, হাতে দিলে পারিজাতের মালা। এ মালা গেঁথেছে ও একলাটি, নিরালায় বসে। স্মিতহাস্যে প্রশান্তর গলায় পরিয়ে দিল। তারপর শুরু হলো উৎসব। নাচ-গানের ছড়াছড়ি। দলে দলে আসছেন অতিথি অভ্যাগতেরা। যার যেমন খুশি পান-ভোজনে মত্ত। থেকে থেকে সানাই বাজছে নহবৎখানায়।...

স্বপ্ন হয়তো আরও অনেক দূর ওকে টেনে নিয়ে যেতো। কিন্তু লিলি অনেকক্ষণ হয় ঘুম থেকে উঠেছে। প্রাতরাশের সময় হয়ে গেছে। গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয় ও অনিতাকে।

স্বপ্ন-ঘোর কেটে যায় অনিতার। আচমকা বিছানার ওপর উঠে বসে। স্বপ্ন-বিজড়িত চোখেই টলতে টলতে কলঘরের দিকে পা বাড়ায়।

চিঠি দেওয়া আর পাওয়ার মধ্যেই কেটে যায় মাসখানেক। বিরহী যক্ষের মতোই দিন গুণে গুণে। প্রশান্ত কাশীতে বদলী হবার

জন্য দরখাস্ত পেশ করে। তদবির-তদারকেও ত্রুটি ছিল না। মাস খানেকের মধ্যেই দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে আসে। ভাবে, অনিতাদের কোনরকম খবর না দিয়ে গিয়ে উঠবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর স্থির থাকতে পারে না। খবর যথারীতি জানিয়ে দেয়। অনিতাকে—সেই সঙ্গে ডক্টর দাশগুপ্তকেও।

ডক্টর দাশগুপ্ত সংবাদ শুনে খুশী হন—শ্রীমতী দাশগুপ্তও। লিলি আনন্দের আতিশয্যে মেতে ওঠে। অনিতাকে ফাঁক পেলেই হাসি-ঠাট্টা শুরু করে। অনুসূয়া প্রিয়ম্বদার ভূমিকা। শকুন্তলাও খুশী হয়। মনে মনে মধুচক্র রচনা করে।

নির্দিষ্ট দিনে বদলী হয়ে আসে প্রশান্ত। সরকারী কোয়ার্টার ঠিক ছিল। ইচ্ছে করলে সরাসরি সেখানেই উঠতে পারতো। কিন্তু শ্রীমতী দাশগুপ্তর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না। সেই সঙ্গে আরও একজনের। সকলের অনুরোধ পায়ে ঠেলতে পারলেও ওর অনুরোধ উপেক্ষা করার শক্তি প্রশান্তর নেই। তা' ছাড়া সে ইচ্ছাও নেই। কি হবে নিরালা কোয়ার্টারে উঠে? কে আছে সেখানে? খবর দিলে অবশ্য মা-বাবা আসতেন। হয়তো দিনকয়েক আগে এসে সবকিছু গোছগাছ করে দিয়ে যেতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তা কি করে সম্ভব! না না, মা-বাবাকে কিছুতেই এর ভেতরে টানা যায় না। তাই শুধু বদলী হবার সংবাদটাই ওঁদের জানিয়ে দেয়। আসার জন্য আর অনুরোধ করে না। যেন সরকার পক্ষ স্বেচ্ছায় ওকে কাশীতে বদলী করেছেন।

স্টেশন থেকে সরাসরি ডক্টর দাশগুপ্তর বাসাতেই এসে ওঠে প্রশান্ত। হ্যাঁ, এই বেশ ভাল ব্যবস্থা—দু'দিন জিরিয়ে নিয়ে কোয়ার্টারে গিয়ে ওঠা।

অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশান্তকে কাছে পেয়ে লিলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অনিতা আশাতীত খুশী হয়। এমনধারা ও ভাবতেও পারে নি।

এই তো সেদিনের কথা, প্রশান্তর সঙ্গে গাড়িতে দেখা। তারপর এল কাশীতে বেড়াতে। এবার তো কাশীতেই বদলী হয়ে এল। হয়তো স্থায়ীভাবেই গড়ে উঠবে ওদের সুখের নীড়। এ আর শুধু আকাশ-কুসুম ভাবা নয়। হাতে-কলমেই কাজ শুরু হয়েছে। প্রশান্ত হয়তো মনের ভাব বুঝেই এতটা এগিয়েছে। সত্যি, খুব সরল মানুষটি। এতটুকু জটিলতা নেই। কাকাবাবু ওঁর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। কাকীমারও খুব মনে ধরেছে ওকে। আর তা হবে নাইবা কেন? এমন মানুষকে কে না ভালবাসবে?···ভাবতে ভাবতে কস্তুরীমৃগীর মতোই আপন মনে ডুবে যায় অনিতা। দেখতে দেখতে কেটে যায় তিনটি দিন। এর ভেতরে ওরা সকলে মিলে ওর কোয়ার্টার সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলেছে। দোর-জানালার পর্দাগুলো নিজে পছন্দ করে কিনেছে অনিতা। টেবিল ক্লথ, ফুলদানী, টিপয় সবকিছু ওর নিজের রুচি মতো। লিলি, প্রশান্ত সঙ্গে থেকেছে মাত্র। লিলিকে মাঝখানে রেখেই ও ওর মতামত জানিয়েছে। প্রশান্ত শুধু ব্যাগ খুলে টাকা গুণে দিয়েছে। এ যেন দেবী প্রতিষ্ঠার আগে তাঁর মন্দির গড়ার কাজ। প্রশান্ত নিশ্চিন্ত। এখন দিন দেখে একদিন আনুষ্ঠানিক উৎসব সম্পন্ন হলেই জীবনপ্রবাহ শুরু হয়। সে প্রবাহে উজাড় করে বিলিয়ে দেবে পরস্পর পরস্পরকে।···স্বপ্ন দেখতে দেখতেই চার দিনের দিন কোয়ার্টারে এসে ওঠে প্রশান্ত। শুধু রাতটুকুই যা একা থাকা। নয়তো ওদের একজন না একজন পাশে থাকেই। ডক্টর দাশগুপ্ত আর শ্রীমতী দাশগুপ্ত এখন অনেকটা ঢিল দিয়েছেন। লিলিও নির্দিষ্ট সময় ছাড়া আসছে না। কোন কোন দিন বাদও পড়ে যায়। কিন্তু অনিতা বিরামবিহীনভাবেই আসছে। সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত ওর হাজিরা চাই। প্রশান্তকে খুশী করতেই ওর আসা। ভগবান ওকে সুযোগও দিয়েছেন। ডক্টর দাশগুপ্তর নির্দেশে গৃহশিক্ষকের ভূমিকা পেয়েছে প্রশান্ত। সুতরাং অনিতার কোনরকম সঙ্কোচের কারণ নেই। স্বচ্ছন্দ গতিবিধি।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আসে—ঋতুর পর ঋতু। গগনে গগনে মেঘের ঘনঘটা। অনিতা এবার এম, এ দেবে। তার পরেই গুরুভার দূর হয়ে শরতের চাঁদ উঠবে হৃদয়-আকাশে। সে চাঁদ বসন্তেরও হতে পারে। অনিতা অনাবিল স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। প্রশান্তরও কোনরকম ভয়-ভাবনা নেই। বিধাতা ওকে নিশ্চিত পথেই হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছেন। মা ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবার জন্য দু'বার তাড়া দিয়েছেন। কিছুটা দুঃখই প্রকাশ পেয়েছে ওঁর শেষের পত্রে। কিন্তু প্রশান্ত নাচার। এ মোহ কাটিয়ে এখন ও কোথাও যেতে পারবে না। তাছাড়া এতে দুঃখেরই বা কি থাকতে পারে। ভগবানের কৃপায় মা-মণি তো কুশলেই আছেন। কি হবে ফাঁকা বাড়িতে পা বাড়িয়ে? সময় উপস্থিত হলে অনিতাকে সঙ্গে করেই একদিন গিয়ে উঠবে। কে জানে, কি থেকে আবার কি গড়ায়। শুনছি সুচরিতা সেই থেকে কেবলই ভুগছে। বেচারী! তা আমি আর কি করতে পারি! রোগা মানুষের মুখ চেয়ে তো আর চিরকাল বসে থাকা যায় না।...প্রশান্তর দৃষ্টিতে সুচরিতা দূরে—বহু দূরে মিলিয়ে যায়। ওর ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন সব এখন অনিতাকে নিয়ে। অনিতার মধ্যেই ও ওর জীবন-সত্যকে খুঁজে পায়।...

শ্রাবণ সন্ধ্যা। আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেছে। সকাল থেকে অবিশ্রান্ত গতিতে জল ঝরছে। ঘরে বসে আলসেমী করার এ এক অপূর্ব দিন। কিন্তু প্রশান্তর পক্ষে কোন উপায় নেই। অফিসে ভীষণ চাপ পড়েছে ক'দিন। বাসায় ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু অনিতার কামাই নেই। প্রত্যহই নিয়মিত হাজিরা দিয়ে যাচ্ছে ও। আবার প্রত্যহই প্রশান্তর বিলম্বে বিরক্তিও বোধ করছে। এক একবার ভাবে, আর আসবে না। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা যথাস্থানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। পরম উৎসাহেই আবার পা চালিয়ে দেয় প্রশান্তর কোয়ার্টারের দিকে।

আজকের দিন ভয়ংকর দিন। রাস্তার ভিখিরীও আজ ভিক্ষায় বেরোয় নি। কিন্তু অনিতা স্থির থাকতে পারে না। প্রকৃতির এই দুর্যোগকে জীবনের সুযোগ বলেই মনে হয় ওর। এই শ্রাবণের বুকের ভেতরে যে আগুন আছে সেই আগুনই ওকে পথ চলার প্রেরণা যোগায়। বই খাতা নিয়ে আজও ও তাই সোৎসাহেই পা বাড়ায়। তবে আজ আর হাঁটা পথে নয়—এক্কা গাড়িতে। উঠতে নামতে শাড়ীর সবটাই ভিজে যায়। ওকে দেখে প্রশান্তর হয়তো খুশী হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু প্রশান্তর কণ্ঠে অনুযোগের ধ্বনিই অনুরণিত হয়। দু'চোখ কপালে তুলেই প্রশ্ন করে, কি করেছেন, আজকের দিনেও মানুষ পথে পা বাড়ায়! যান, জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলুন!

কিন্তু প্রশান্তর অনুযোগে অনিতা দমে না। ওর বরং ভালই লাগে। এক ঝলক চোখ তুলে তাকায় কেবল প্রশান্তর দিকে। যেন বিদ্যুৎ ঝলক। মিটমিট করে হাসতে থাকে শুকনো জামা-কাপড়ের অপেক্ষায়।

প্রশান্ত যেন মহা ফাঁপরে পড়ে। কোথায় পায় ও এখন শুকনো শাড়ী আর ব্লাউজ! জেনানা মহলে তো শুধু একা ভজহরি—বিশ্বস্ত ভৃত্য তথা রাঁধুনী! কিন্তু তা আর কি করা। খানিকটা ইতস্তত করে সুটকেস খুলে নিজের একপ্রস্থ ধুতি, শার্ট, গেঞ্জিই বার করে দেয়।

অনিতা ঠোঁটে হাসি রেখেই বিস্ময় প্রকাশ করে, এইগুলো!

অগত্যা, বড়জোর একটা স্লিপিং গাউন দিতে পারি, প্রশান্তর ঠোঁটেও এবার হাসি দেখা দেয়।

বেশ তো, তাই না হয় দিন। নয়তো এগুলো কি করে পরি!—আবার এক ঝলক চোখ তুলে তাকায় অনিতা।

উত্তরে প্রশান্ত হাসতে হাসতেই পাশের আলনা থেকে স্লিপিং গাউনটা টেনে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দেয়।

অনিতা আর কথা বাড়ায় না। পোষাকগুলো হাতে করে পাশের ঘরে চলে যায়।

প্রশান্ত অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে ওর গমন-পথে। ভিজে জামা-কাপড়ে ওর তনুশ্রীতে যেন নতুন জোয়ার বইছে।

কিছুক্ষণ পরেই অদ্ভুত বেশভূষায় ফিরে আসে অনিতা। ভৃত্য ভজহরি চায়ের সরঞ্জাম এনে হাজির করে। অনিতা লিকারের সঙ্গে দুধ চিনি মিশিয়ে নেয়। দু'জনে মুখোমুখি হয়ে আসরে বসে। কিন্তু প্রশান্তর হাতে সময় নেই। দশটার ভেতরেই আপিসে পৌঁছুতে হবে ওকে। এখন বাজে সাড়ে আটটা। তাড়াতাড়ি চা পান শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। এক্ষুনি ওকে স্নান সেরে নিতে হবে।

কিন্তু অনিতা আজ গল্প করতেই এসেছে। রোজ রোজ পাঠ বুঝে নেবার মতো কাঁচা ছাত্রী ও নয়। তবে প্রশান্ত যদি কাব্যচর্চা করতে চায় তাতে ও রাজি। এমন বাদলার দিনে খুবই আমেজী ব্যবস্থা। গান শুনতে চাইলেও পর পর ও গেয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রশান্ত যে আজও তড়িঘড়ি করছে। আজও অফিসে বেরুবে নাকি? চেয়ার ছেড়ে উঠতেই অনিতা বাধা দেয়, কি হলো, উঠছেন যে!

উঠছি যম তাড়নায়। ক'টা বাজল খেয়াল আছে? —হালকা হেসেই উত্তর করে প্রশান্ত।

আজও আপিসে বেরুতে হবে

রেনি-ডে স্কুলেই হয় দেরি—আপিসে নয়।

ইচ্ছে করলে আপিসেও হতে পারে।

পারে—তবে আপনাদের জন্যই তা সম্ভব নয়।

তার মানে?

মানে সরকারের লাল ফিতের খোঁটা আপনারাই দিয়ে থাকেন।

সে আর এক দিনের জন্য নয়।

ঐ একদিন একদিন করেই সময় বেড়ে যায়।

আপনার তা হবে না। জল-ঝড়ে আজ না বেরুলেন।

বিশ্বাস করুন, সত্যি বেরুতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু উপায় নেই ওপর থেকে আজ দু'জন হায়ার অফিসার আসছেন। একটা জরুরী

এন্‌কোয়ারী আছে। —কথা শেষ করে প্রশান্ত বাথরুমের দিকেই এগুতে যাচ্ছিল, সহসা থমকে দাঁড়িয়ে আবার শুরু করে, কি হলো? দেবীর মুখখানা যে সহসা শ্রাবণের আকাশ হয়ে উঠল?

অনিতা তবু হালকা হতে পারে না। গম্ভীর থেকেই উত্তর দেয়, আমিও তাহলে আপনার সঙ্গেই ফিরছি।

এই বেশে তো?

না, আমি আমার নিজের জামা-কাপড় পরেই যাবো।

তা হতে পারে না। একবারের ঝুঁকিই সামলাতে পারেন কিনা দেখুন। আর একবার ভিজলে নির্ঘাত নিমোনিয়া।

হয় হবে, ঔদাস্য ঝরে পড়ে অনিতার কণ্ঠস্বরে।

প্রশান্ত হেসে হেসেই বাধা দেয়, আমি হতে দিলে তো। বসুন, এক্ষুনি আসছি। —অনিতাকে আর পালটা জবাবের সুযোগ না দিয়ে সোজা বাথরুমে ছোটে প্রশান্ত।

অনিতাও একা বসে থাকতে পারে না। হেঁসেলে ভজহরির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আজকের রান্না খুবই সাদাসিধে। গরম গরম ইলিশ মাছ ভাজা আর খিচুড়ি। কিন্তু সাদাসিধে হলেও আজকের দিনের উপযোগী রান্নাই বটে। প্রশান্ত অনিতা দু'জনেরই এ রান্না প্রিয়। ভজহরি আগে থাকতেই আজ অনিতার আশা করেছিল। তাই আয়োজনের ত্রুটি নেই। সকলের হয়েও হয়তো কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকবে।

প্রশান্ত বাথরুম থেকে ফিরে আসে। ভজহরি দু'খানা ঠাঁই করেই পারস সাজাতে থাকে।

অনিতা চোখ কপালে তুলে বাধা দেয়, ওকি ভজদা, দুটো জায়গা করছো যে।

ভজহরি সহাস্যে জবাব দেয়, দুটো করবো না কি একটা করবো?

না না, আমি এখন কিছুতেই খেতে পারবো না। তুমি শুধু ওঁকেই দাও। —অনিতা পাশ কাটাতে চেষ্টা করে।

উত্তর আর ভজহরিকে দিতে হয় না। প্রশান্তই দেয়, আজকের দিনে যে এ জিনিস ত্যাগ করতে পারে, বলতে হবে, তার রসবোধ নেই। নিন, বসে পড়ুন। আমার আর সময় নেই।

বারে, ভারি আবদার তো। খিদে না পেলেও খেতে হবে বুঝি?

খেতে খেতেই খিদে পাবে, বসে পড়ুন।

অনিতা আর আপত্তি করতে পারে না। শিক্ষকের আদেশই যেন ঝরে পড়ছে প্রশান্তর কণ্ঠে। একান্ত অনুগতের মতোই নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ে। ভজহরির রান্নার আজ তারিফ করতেই হবে। মুখরোচক খাবার দু'জনের হাসি ঠাট্টায় অধিকতর মুখরোচক হয়ে ওঠে।

আহার পর্ব শেষ করে তাড়াতাড়ি এসে আপিসের পোষাক পরে নেয় প্রশান্ত। অনিতা ওকে কোট পরিয়ে দিয়ে সাহায্য করে। জল তখনো পুরোদমে পড়ছে। স্টেশন ওয়াগন এসে দোরে দাঁড়ায়। হর্ন বাজার সঙ্গে সঙ্গে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকে প্রশান্ত। নামতে নামতে অনিতাকে আশ্বাস দেয়, আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরছি। আপনি ইচ্ছে করলে একটা ভাত-ঘুম দিয়ে নিতে পারেন।

অনিতা কখনো দিবা-নিদ্রা যায় না। তাই সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়, এই সাত সকালে ঘুমিয়ে শরীর খারাপ করবে কে। তার চেয়ে—

তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, সেক্সপিয়ার যাকে খুশি—সেলফ্ থেকে টেনে নিয়ে সঙ্গী করুন। অধম কেরানীর সঙ্গে আর নয়, মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয় প্রশান্ত।

অনিতা আর কোন প্রত্যুত্তরের সুযোগ পায় না। প্রশান্ত গিয়ে গাড়িতে ওঠে।

কাব্যের মধ্যে সারাটা দুপুর ডুবে থাকে অনিতা। মেঘ-মেদুর বর্ষায় কালিদাসকেই ওর ভাল লাগে। অপূর্ব বিরহ-কাব্য মেঘদূত।

প্রিয়জনের চিন্তামগ্ন যক্ষ-প্রিয়া। নির্বাসিত যক্ষের জীবনেও উৎকণ্ঠার সীমা নেই। দয়িতের কাছে মেঘকে দূত করে পাঠিয়ে নির্বাসনের দিন গুণছে সে। দিন গুণছে পুনর্মিলনের।…পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে যায় অনিতা। ও যেন বিরহিণী যক্ষ-প্রিয়াই। নিঃসঙ্গ নির্বাসনই যেন হয়েছে ওর। সারাটা দুপুর গভীর বেদনার মধ্যে কাটে। কিন্তু শ্রাবণ-বেলা আর কাটে না। তবু তারই এক ফাঁকে সাঁয়াহ্ন ঘনিয়ে আসে। ওর প্রিয়জনের ফেরার সময় হল। হ্যাঁ, প্রশান্ত তো ওর প্রিয়জনই—প্রিয়তম। সারাটা দুপুর ওঁর ধ্যানেই তো কেটেছে। কাব্য রেখে উঠে দাঁড়ায় অনিতা। নিজের হাতে ঘর-দোর গুছিয়ে ফেলে। বৃষ্টির ধকল এখন আর নেই। গুড়িগুড়ি পড়ছে। প্রশান্তর সখের বাগান থেকে ফুল তুলে এনে ফুলদানী ভরিয়ে দেয়। আলমারী খুলে নতুন পর্দা বার করে দোর-জানলায় পালটিয়ে দেয়। টেবিল, আলনা, চেয়ার সবকিছু তকতক ঝকঝক করছে। কিন্তু এত কাজ করেও ঘড়িতে মাত্র পাঁচটা। উনি তো বলে গেলেন শীগগিরই ফিরবেন। হয়তো বা এক্ষুনি এসে পড়বেন। অনিতা আর দাঁড়ায় না। বাথরুমে গিয়ে গা-হাত-পা সাবান দিয়ে ধুয়ে আসে। সকালের জামা-কাপড়গুলো বেশ শুকিয়ে গেছে। ইলেক্‌ট্রিক ইস্তিরি দিয়ে নিজের হাতে ভাল করে ইস্তিরি করে নেয়। তারপর পরিপাটি করে পরে বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। সাদাসিধে পোষাকেও বেশ দেখাচ্ছে ওকে। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রসাধন শেষ করে। কিন্তু প্রশান্তর যে এখনও দেখা নেই! ভজহরির সঙ্গে জলখাবার তৈরি করতেই লেগে যায়—হিঙের কচুরী আর ঝাল বড়া। বাদলার দিনে বেশ মুখরোচক খাবার। হাতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসে—সদরে মোটরের হর্ন শোনা যায়। হয়তো বা স্টেশন ওয়াগনই হবে। মনে মনে পুলক হয় অনিতার। কান পেতে অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু না, নির্দিষ্ট সময়ের পরেও অনেকটা কেটে যায়। কলিং-বেলে কোনরকম সঙ্কেত-ধ্বনি হয় না! বিরক্তিতে উঠে

গিয়ে গাড়ি বারান্দার রেলিংএ এসে দাঁড়ায়। ইতিউতি চোখ ঘুরিয়ে দেখে যায়। রাস্তার সবটাই ফাঁকা। পথচারী অন্য কোন গাড়ি হবে। চলে গেছে। না, আর ও অপেক্ষা করবে না। সেই কোন সকালে এসেছে! একা একা মানুষ কতক্ষণ কড়িকাঠ গুণতে পারে। চলেই যাবে ও! ঝোঁকের মাথায় ভজহরিকে বলেও ফেলে। কিন্তু ভজহরি মুখে কোন উত্তর দেয় না। মুচকি মুচকি হাসতে থাকে শুধু। ও যেন বলে, যেতে চাইছ? কিন্তু তা পারবে না। আমি সম্মতি দিলেও না।...সত্যি, অনিতা যেন জোর করতে পারে না। নিজের মনেই দমে যায়। আরও খানিকটা দেখবে ও—আরও ঘণ্টাখানেক। কিন্তু এই সময়টা করে কি ও? পড়াশুনোয় আর কিছুতেই মন বসবে না। সারাটা দুপুর কেটেছে বই নিয়ে।...ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপে মাথায়। ফুলদানীতে দিয়েও অনেকগুলো রজনীগন্ধা বেশী রয়েছে। একটা কাঁচি দিয়ে সমান করে কেটে ফেলে ফুলগুলো। তারপর ড্রয়ার টেনে খানিকটা সুতো আর ছুঁচ বার করে। খেয়ালে খেয়ালে সুন্দর একটা মালা গেঁথে ফেলে। মালাকরদের চেয়েও সুন্দর সুশ্রী এক মালা। শুধু গেঁথেই নিশ্চিন্ত হতে পারে না। ভজহরি নীচে গেছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মালাটা দেয়ালের গায়ে টাঙানো প্রশান্তর একটা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির গলায় ঝুলিয়ে দেয়। হয়তো ভক্তিভরে প্রণামও করতো প্রিয়জনকে, কিন্তু তার আর সময় পায় না। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা যায়। চেয়ার থেকে নামবারও সুযোগ পায় না অনিতা, প্রশান্ত ঘরে ঢুকে উচ্ছ্বাস জানায়, বাঃ, চমৎকার! আজকের সব কিছুর মধ্যেই যেন অপূর্ব প্রাণের সাড়া। শুধু—

শুধু আপনারই কিছু বদলায় নি। সেই রাত করে বাড়ি আসা, মুখ থেকে কথা টেনে নিয়ে হালকা হাসি হাসে অনিতা।

কি করবো বলুন। বরাত মন্দ, নয়তো কে আর এমন মধুর সঙ্গ ছেড়ে আপিসে কলম পেশে।

খুব হয়েছে, বক্তৃতা রেখে কোট পেন্টলুন্ ছেড়ে ফেলুন।

খুব যে তাড়া দেখছি, মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা আছে নাকি?

বাড়ি বয়ে মিষ্টি খাওয়াবার সাধ আমার নেই। তাছাড়া আজকের দিনে ওটা তেমন মুখরোচকও নয়।

তা হলে?

তা হলে এক কাপ চা কিংবা কফি তৈরি করে খাওয়াতে পারি। আর তাও মহাশয়ের পয়সায়।

বেশ বেশ, তাতেই যথেষ্ট। অমন 'ডেলিকেট' হাতের চা পেলে আমার আর অন্য কোন মিষ্টির দরকার নেই। বিশেষ করে ওর সঙ্গে যদি থাকে সুমধুর কণ্ঠ-সংগীত।

আশা তো কম নয়।

দুরাশা নিশ্চয়ই নয়।

অনিতা এবার আর কোন উত্তর দিতে পারে না। এক ঝলক তাকায় মাত্র। তারপর মুখ নত করে নেয়।

কিছুটা লজ্জা প্রশান্তরও হয়। কিন্তু দেওয়ালের ওপর চোখ পড়তেই আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বিস্ময় বিহ্বলভাবেই প্রশ্ন করে, ওটার গলায় আবার মালা পরালো কে। ভজদার কাঁধে তো কখনও এ ভূত চাপে নি!

ভূত না হয় আমার কাঁধেই চেপেছিল। যদি বলি—

যদি নয়—নিশ্চয়, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিতে দিতে এক লহমায় চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে মালাটা টেনে নেয় প্রশান্ত। কোনরকম জড়তায় না জড়িয়ে ঝাঁ করে অনিতার গলায় পরিয়ে দেয়।

অনিতার মন সব জানতো—তবু কিছুটা সংশয় ছিল। আজ সেই সংশয় থেকেই মুক্তি পেল ও। বিনিময়ে প্রশান্তর পায়ের ধুলো মাথায় নেওয়া ওর উচিত। কিন্তু কেন যেন ও তা পারে না। হয়তো লজ্জা—নয়তো আর কিছু। মুখ নত করে দাঁড়িয়েই থাকে অনিতা।

ভজহরি খাবারের ট্রে নিয়ে হাজির হয়।

## দশ

আজ তিনদিন প্রশান্তর জ্বর চলেছে। গায়ে হাতে অসম্ভব ব্যথা। হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জা। তবু সাবধানে থাকা উচিত। সময়টা ভাল নয়, মায়ের দয়াও হতে পারে। প্রশান্ত যেন কিছুটা ভয়ই পেয়েছে। একা থাকলে দুশ্চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু সংসারে ভজহরি ছাড়া আর কে আছে! বেচারা, কোন্‌দিক সামলাবে। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা না ঘর-দোরের কাজ? যা হোক, সেবা-শুশ্রূষা নিয়ে আর ওকে মাথা ঘামাতে হয় না। অনিতাই সে ভার নিয়েছে। সেবা-শুশ্রূষা সব। রোগ শয্যায় প্রশান্তর এ এক পরম সুখ। অনিতার সান্নিধ্য নিবিড় হতে নিবিড়তম হতে চলেছে। তিনদিন বেচারার ছুটোছুটির বিরাম নেই। শুধু রাতটুকুই যা বাড়িতে ঘুমোয়। তাও ফিরতে ফিরতে প্রায় দশটা বেজে যায়। কিন্তু ওকে এটুকু চোখের আড়াল করতেও যেন প্রশান্ত রাজী নয়। ফিরবার সময় প্রায়ই ওর মুখখানা ভারাক্রান্ত দেখা যায়। অনিতা দু'দিকই বজায় রাখে। সারাদিন প্রশান্তর শিয়রে থাকলেও রাত্রিবাস বাড়িতেই করছে। প্রশান্তর মনের ভাব ও বোঝে। তবু জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু আজ মুশকিল দেখা দিয়েছে। জ্বরের তীব্রতা প্রশান্তর আজ প্রচণ্ড। ভজহরিও আক্রান্ত হয়ে পড়েছে—বেহুঁশে কাটছে ওর। আজ ওঁদের সারারাত একা ফেলে রাখা সম্ভবপর নয়। অনিতা বিচলিত হয়ে পড়ে। কাকামণিকে একবার খবর দিতেই মনস্থির করে। যদি প্রয়োজন মনে করেন ডাক্তারবাবু না হয় রাত্রে থাকুন। অবশ্য সন্ধ্যালে দেখে উনি অভয় দিয়েই গেছেন। তবু বলা যায় না। সাবধানের মার নেই।...

অনিতাকে আর বেশীক্ষণ ভাবনা-রাজ্যে হাবুডুবু খেতে হয় না। ডক্টর দাশগুপ্ত বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে এসে হাজির হন। ভজহরির জ্বরের কথা তিনি জানতেন না। তাই তেমন কোন ভাবনাও ছিল না! কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই বিচলিত হয়ে পড়েন! এক্ষেত্রে অনিতার সাহায্য ছাড়া উনি কতটুকুই বা করতে পারেন! শ্রীমতী দাশগুপ্ত দু'দিন হয় ছেলেপুলেদের নিয়ে ভাইয়ের বাসায় মোরাদাবাদ বেড়াতে গেছেন। ফিরতে দিনকয়েক দেরি হবে! এ দু'দিন সংসার চলেছে ঠাকুর-চাকর আর অনিতার সাহায্যে। বেচারা, প্রশান্তকে দেখবে না সংসার সামলাবে! কিন্তু ও ছাড়া যে গত্যন্তরও নেই! রোগীর সেবা-শুশ্রূষা তো বিন্দুমাত্রও জানেন না উনি! রাত্রি জাগরণ একেবারেই ধাতে সয় না! ডক্টর দাশগুপ্ত বিচলিতভাবেই অনিতাকে শুধোন, তাই তো অনু, আজ রাত্রে তো কিছুতেই ওদের একা রাখা যায় না! আমি না হয় এক্ষুনি কলকাতায় জরুরী তার করে দিচ্ছি—আদিনাথ-বাবু সস্ত্রীক আসুন! তুই কি কোনরকমে আজকের রাতটা চালিয়ে নিতে পারবি?

চক্ষু লজ্জা কাটাবার জন্য অনিতা এই অনুমতিটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল! সুতরাং খুশী মনেই উত্তর দেয়, কেন পারবো না! তা'ছাড়া সামান্য একটু জ্বরের জন্যে ওদের টেলিগ্রাম করে বিব্রত করা কি উচিত হবে?

অনিতার উত্তরে ডক্টর দাশগুপ্ত আশ্বস্ত হন। খোলাখুলিই উচ্ছ্বাস জানান, তা তুই যদি ভার নিস তা হলে আজ আর টেলিগ্রাম করছিনে। কাল সকালে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেই কর্তব্য স্থির করবো।

বেশ, তাই হবে—অনিতা অবিচলিত থেকেই উত্তর দেয়।

কিন্তু আমি ভাবছি কি, শেষটায় না আবার তুইও গোল বাধাস।

আমার জন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। ভারি তো একটু ওষুধ আর পথ্য দেওয়া।

বেশ, আজকের রাত্রের মতো তাহলে এই কথাই রইল। আমি নিধুকে দিয়ে তোর রাত্রের খাবার এখানেই পাঠিয়ে দেবো। মিছিমিছি দৌড়-ঝাঁপ করে লাভ নেই, বলতে বলতে প্রশান্তর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ান ডক্টর দাশগুপ্ত।

প্রশান্তর কোন সাড়াশব্দ নেই। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডক্টর দাশগুপ্ত বাইরের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও আবার ইতস্তত করেন। অনিতাকে লক্ষ্য করেই বলেন, নিধু না হয় আজ এখানেই থাকবে'খন। একা একা তোর অসুবিধা হতে পারে।

আমার কোন অসুবিধাই হবে না। কিন্তু নিধু ছাড়া তোমার চলবে কি করে?—অনিতার ঠোঁটে কিঞ্চিৎ হালকা হাসি।

ডক্টর দাশগুপ্তর ওষ্ঠে তার রেশ লাগে। সমতা রেখেই বলেন, কেন, আমি কি কচি খোকা নাকি যে নিধু ছাড়া একটা রাতও কাটবে না!

কচি খোকা নয়—তারও বাড়া। নিধু না থাকলে বাবুর হয়তো সারারাত মশারী ফেলাই হবে না। তারপর ম্যালেরিয়ায় ধরুক আর কি! না, কাজ নেই বাপু, তুমি বরং খাবারটাই ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিও—থাকতে হবে না।

বেশ, তাই হবে, আমি চললুম।

ডক্টর দাশগুপ্ত বেরিয়ে যান। অনিতা প্রশান্তর শিয়রে বসে ধীরে ধীরে হাতপাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করতে থাকে।

রাত বারোটা। ভজহরি পাশের ঘরে নিদ্রিত। গায়ের উত্তাপ এখন অনেকটা কম। আর হয়তো ভয়ের কোন কারণ নেই। ওষুধে কাজ হয়েছে। প্রশান্তর অবস্থাও বেশ ভাল। সন্ধ্যার দিকে মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পেলেও এখন বেশ ঘুমুচ্ছে। অনিতা আর বসে থাকতে পারে না। ক'দিন সমানে ধকল যাচ্ছে। সমস্ত শরীর অবসন্ন। ঘুমের আমেজে দু'চোখ বুজে আসছে। উঠে গিয়ে একবার দু'চোখে

জল দিয়ে আসে। কিন্তু না, শরীরের মাদকতা কিছুতেই দূর হয় না। তা মন্দ কি, ওরা দু'জনেই তো বেশ ঘুমুচ্ছে। এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নিলে ক্ষতি কি? ডাক্তার সাহেব তো বলে গেছেন ঘুমুলে আর ওষুধের দরকার নেই। সেই ভাল, খানিকটা ঘুমিয়েই নেওয়া যাক! ...অনিতা প্রশান্তর খাটের কাছেই ইজি-চেয়ারটা টেনে নিয়ে ঘুমুবার আয়োজন করে। কিন্তু জ্বরটা আর একবার দেখা দরকার। প্রশান্তর জামার বোতাম খুলে ধীরে ধীরে বগলে থার্মোমিটার লাগায়। না, জ্বর এখন সামান্যই। ভোরের দিকে ছেড়েও যেতে পারে। ভজহরির উত্তাপও বেশ কম। অনিতা নিশ্চিন্ত হয়ে ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

আরও গভীর রাত্রি। ঘড়িতে দু'টো বাজল। চারদিক জুড়ে খাঁখাঁ করছে রাত্রির নিস্তব্ধতা। সহসা প্রশান্তর ঘুম ভেঙে যায়। গলা শুকিয়ে কাঠ। ভীষণ তৃষ্ণা। অনিতাকেই ডাকবে ভাবে। কিন্তু পারে না। ওর বুকের ওপর অন্তঃসলিলা ফল্গুর সমাবেশ ঘটেছে। হৃদয় সেখান থেকে আকণ্ঠ পান করতেই উৎসুক। হ্যাঁ, পান তৃষ্ণা তাতেই তৃপ্ত হবে—জীবন তৃষ্ণাও।

ঘুমের ঘোরে অনিতার বাঁ হাতখানা প্রশান্তর বুকের ওপর পড়েছে। হয়তো রোগীর দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করতে গিয়ে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হুঁশ নেই—তাই সঙ্কোচও নেই। কিন্তু প্রশান্ত উচাটন। পান-তৃষ্ণা ধীরে ধীরে জীবন তৃষ্ণায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সামান্য জল পানে তা তৃপ্ত হবার নয়। সারা দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহ বইছে। আদিম মানুষ জেগে উঠছে ওর শিরা-উপশিরায়। চোখ মেলে তাকায় প্রশান্ত। নীল আলোর মদকতা ছাড়িয়ে রয়েছে ঘরময়। যেন বন-ময়ূরী পাখা বিস্তার করে আছে। ভাবাবেগে বাঁধ ভাঙতে চায় প্রশান্তর। কিন্তু জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। মাথার পোকাগুলো জট পাকাতে থাকে। হয়তো বা নীতির যুক্তিজাল। আবার চোখ বোজে

ও। অনিতার হাতের ওপর নিজের ডান হাতখানা রেখে ঘন ঘন ঢোক গিলতে থাকে। এক সময় হয়তো একটু জোরেই চাপ পড়ে। হাত টেনে নেয় অনিতা। পাশ ফেরে। কিন্তু আর কোন সাড়াশব্দ নেই। হয়তো ঘুমের ঘোরেই অলস্ত্য ত্যাগ করল। কিন্তু প্রশান্ত আর সাহস পায় না। শঙ্কায় নিজেও পাশ ফিরে শোয়। ঘুমুতেই চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই আর ঘুম আসে না। উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসে। টিপয়ের ওপরেই জলের গ্লাস ঢাকা দেওয়া রয়েছে। খানিকটা জল পান করলেই হয়তো দেহ শীতল হয়। ঘুমও আসে। কিন্তু জলের গ্লাস আনতে গেলে অনিতাকে ডিঙিয়ে যেতে হবে। অসুস্থ শরীরে যদি তাল সামলাতে না পারে? যদি ওর গায়ের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে! কি ভাববে ও! পড়ে না গিয়ে শব্দও তো হতে পারে। বেচারার ঘুমটাই মাটি হবে। সারাদিন পরিশ্রম গেছে, একটু না ঘুমুলে চলবে কেন।

...প্রশান্ত আর এগুতে পারে না। বিছানার ওপরে বসেই ইতস্তত ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে আবার চোখ তুলে তাকায় একবার অনিতার দিকে। পূর্ণিমার চাঁদের মতোই ঢলঢল করছে মুখখানা—নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু প্রশান্তর অশান্ত বুকে তবু দুর্জয় তৃষ্ণা। হিংস্র দৃষ্টিতে হয়তো বা ক্ষত-বিক্ষতই হয়ে যায় পূর্ণিমার চাঁদ। প্রশান্ত আর তাকাতে পারে না। বেড্ সুইচ্ টিপে দিয়ে বালিশে মাথা দেয়। অনিতার এবার ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড় করে চেয়ারের ওপরে উঠে বসে। ঘর অন্ধকার—কিছুই দেখতে পায় না। কেমন যেন ভয় ভয় করে ওর। কাঁপা গলায় ডাকে, প্রশান্তবাবু—প্রশান্তবাবু—

প্রশান্ত যেন শুনেও শোনে না। চুপচাপই পড়ে থাকে।

অনিতা আবার ডাকে, প্রশান্তবাবু, ঘর অন্ধকার কেন? আপনি ঘুমুন নি!

প্রশান্ত এবার ঢোক গিলে উত্তর করে, ঘুম আসছে না।

ছু'বার ছু'জন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে আনা হয়েছে। সকলেই ওঁরা একমত, কঠিন ছুশ্চিন্তা থেকেই রোগের উৎপত্তি। কিন্তু কি সে ছুশ্চিন্তা হতে পারে। খাওয়া-পরার কোন অভাব নেই। সখ-আহ্লাদেও বাধা নেই। তবে !...জিজ্ঞেস করলেও তো কিছু বলে না মেয়ে। ডাক্তাররা যাই কেন বলুন না, রোগ না থাকলে দেহ কখনও ভাঙে। তবে কি শেষটায় পাগল হয়ে যাবে সুচরিতা। না না, তাইবা কি করে সম্ভব ? পিতৃমাতৃ কুলে তো কারও কোনদিন এ রোগ নেই। সুচরিতার কি ভাবনা তা ও-ই জানে। কিন্তু দাছুর চোখে ঘুম নেই। এত আদরের নাতনীর এই হাল। পর পর ছু'বার বাধা পড়ল। কে জানে কি বিধিলিপি। এর পর প্রশান্তর মা-বাবা বেঁকে বসলে দোষ দেবার কিছু থাকবে না। মা-বাবা দূরের কথা প্রশান্ত নিজেই বা কতদিন ধৈর্য রাখতে পারবে। দূর দেশে একা থাকে বেচারা। ঘর বাঁধবার বয়স যথেষ্টই হয়েছে। বয়সের চেয়েও মন-ঘোড়ার দৌড় শুরু হয়েছে। কিন্তু ছু'বারই বাধা পড়ল। ওর আশেপাশে আরও ছু'চার ঘর বাঙালী নিশ্চয় আছেন। তাঁদের ন্যূনতম স্নেহ-মমতাই এ সময়ে ওর কাছে অনেক। অশান্ত মনে তার আকর্ষণ কম নয়। সুচরিতার মতো কারও ঘরে বিয়ের যোগ্য মেয়েও থাকতে পারে। তার স্বাভাবিক আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা কি কম কথা। ওর হৃদয়ে আর সুচরিতার স্মৃতি কতটুকু জাগরুক আছে। সে তো কবেকার কোন্ ছোটবেলার কথা। ছু'জনে একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে। বড় হয়ে কেউ কাউকে ভাল করে দেখেও নি। আমিই গল্পে গল্পে সুচরিতাকে অনেকটা তৈরী করে এনে ছিলাম। প্রশান্ত ছাড়া আর কাকেও ও ভাবতে পারে নি। সহুর মার মুখে শুনেছি মণ্ডপ ঝাঁট দিতে এসে সে নিজের চোখে দেখেছে, সুচরিতা প্রশান্তর ফটোখানা কোলে করে বসে আছে। কিন্তু এতে ছুর্ভাবনার কি থাকতে পারে ? বিয়ে তো তোদের হচ্ছিলই। তুই অসুস্থ হয়ে না পড়লে কোন বাধাই ছিল না।—দাছুর ভাবনা বেড়ে যায়। কোন কিনারাই করে উঠতে পারেন না।

না, দিন দিন শরীর ভেঙে যাচ্ছে সুচরিতার। ডাক্তাররা বলছেন, কোথাও কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে দিনকতক থাকা দরকার। তাতে শরীর এবং মন দুই-ই ভাল হবে।...দাদু তাই যাবেন। সুচরিতার যদি মঙ্গল হয় তা হলে উনি নরকে যেতেও রাজি।

বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে বিল্বপত্রাঞ্জলি দেবার সাধ অনেক দিনের। ভেবেছিলেন, সুচরিতার বিয়েটা চুকে গেলেই বেরুবেন। কিন্তু মনের সে সাধ আর পূর্ণ হলো না। হয়তো কোন মহাপাতকেই তা হয় নি। বাবার চরণ স্পর্শে সে পাতক যদি দূর হয়। কাশী যাওয়াই স্থির করেন দাদু। কাশী নিশ্চয় তেমন স্বাস্থ্যকর জায়গা নয়। কিন্তু কাশীর পাশেই রয়েছে চুনার—অতি উত্তম স্বাস্থ্য নিবাস। সর্বপ্রথম বাবার চরণ দর্শন তারপর চুনার যাত্রা। চিকিৎসকদের নির্দেশ মতোই তৈরী হন দাদু। লক্ষ্মীপুজোর পরের দিনই রওনা হবেন।

এখান থেকে আর সুচরিতার সঙ্গী হিসেবে বিশেষ কেউ যাচ্ছে না। শুধু সদুর মা আর একজন রাঁধুনী। হুঁকো সাজা আর গায়ে তেল মাখাবার জন্য দাদুর পেয়ারের চাকর রামনিধি অবশ্যই যাবে। সুচরিতা যদি আবদার করে তাহলে কাশী থেকে অনিতাকে সঙ্গে নেওয়া যাবে। ওর মতো ভাল সঙ্গী আর কে আছে। ওদের দুটিতে তো হরিহর আত্মা।

নির্দিষ্ট দিনে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করে গাড়িতে উঠে পড়েন দাদু। সুচরিতা এ ক'দিন বেশ সুস্থই আছে। বেশ হাসিখুশীই দেখাচ্ছে ওকে। কতদিন পরে অনিতাকে দেখতে পাবো। কাশী থেকে লক্ষ্ণৌও বেশী দূর নয়। কে জানে, কোন কাজে যদি উনি এসে পড়েন তো ওঁর সঙ্গেও দেখা হতে পারে। কাজ না পড়ে অনিদিকে দিয়ে চিঠি লেখানোও যেতে পারে। দাদুও নিশ্চয় খবর করবেন।...সুচরিতা অনেকদিন পর আজ একটু স্বাভাবিক। মা বাবা ভাই বোন সকলের কাছ থেকে খোলা মনেই বিদায় নেয়। ওর স্বাভাবিক আলাপ আচরণে সকলেই খুশী হয়।

মধ্যম শ্রেণীর টিকেট সুতরাং কোন অসুবিধা নেই। বেশ হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারে ওরা। রাত্রে ঘুমোবার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু ঘুমোবার জন্য সুচরিতার কোন গরজ নেই। দেশ-ভ্রমণ ওর বরাবরের সখ। এই তো বেশ ভাল—দুদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে।

চলতে চলতে সুচরিতা বলে, আমরা তাহলে সোজা অনিদির ওখানেই উঠছি তো দাদু?

হেসে দাদু বলেন, তোর অনিদির নিজের বাড়ি হলে আমরা নিশ্চয় তাই উঠতুম। কিন্তু ওটা যে ওর কাকার বাড়ি। উনি আমাদের কুটুম। বিনা আমন্ত্রণে কি কখনো কুটুমের বাড়ি উঠতে আছে দিদিভাই!

সুচরিতা ঘাড় নাড়ে, তা ঠিক। তা'হলে?

তোকে কিছু ভাবতে হবে না। আমরা সোজা উঠবো আমাদের পাণ্ডা ঠাকুরের ওখানে। দশাশ্বমেধ ঘাটে চমৎকার ওঁর ঘর-দোর—রীতিমতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ওখান থেকেই বাবার মাথায় ফুল বেলপাতা দেবো। তারপর সময় করে ওঁদের সকলের সঙ্গে একদিন দেখা করলেই হবে।

হ্যাঁ, এই বেশ ভাল ব্যবস্থা। বলা যায় না অনিদির কাকা আবার কোন্ মেজাজের মানুষ হবেন!

না না, উনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি। তবু বুঝলে না দিদি ভাই, কুটুমের বাড়ি না ওঠাই ভাল। ওতে দুদিকেরই অসুবিধা হতে পারে।

তা ঠিক। তবে অনিদিকে কিন্তু পৌঁছেই খবর দিতে হবে।

বেশ, তা দেবো।

সুচরিতা আর কথা বাড়ায় না। আবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া। সন্ধ্যার খানিক পরেই আকাশে চাঁদ ওঠে। শরতের সুনির্মল চাঁদ। গাড়ি ক্ষিপ্রগতিতে ছুটেছে। জ্যোৎস্নার বুক চিরে কোন একটা অজগরই যেন এঁকেবেঁকে চলেছে।

সুচরিতা ঘুমুবেই না ঠিক ছিল। কিন্তু গাড়ির ঝাঁকুনিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। দাদু আর ওকে ডাকেন না। তা'ছাড়া রাত্রের খাওয়াও চুকে গিয়েছে। এখন খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়াই ভাল। রোগা শরীর, ক্লান্তি কম হয় নি। দাদু গড়গড়া টানতে টানতে স্নেহাপ্লুত নয়নে তাকিয়ে থাকেন ওর সন্ত-ঘুমিয়ে পড়া মুখখানার দিকে। তাকাতে তাকাতে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কি সুন্দর খুকীর মুখখানা! যেন তুলি দিয়ে আঁকা। চাঁদের মতোই সুষমা-মণ্ডিত সোনামুখ। কিন্তু আজকের এই কৃষ্ণার চাঁদের মতোই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। কিন্তু কেন? ওর মুখে কি আবার সহজ সরল হাসি ফুটে উঠবে না?...

সুচরিতা হয়তো গভীর নিদ্রাতেই মগ্ন কিন্তু দাদুর চোখে ঘুম নেই। ভাবতে ভবতে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে ওঁর গণ্ড বেয়ে। হাতের নলটা নামিয়ে রেখে দু'হাত কপালে তুলে স্মরণ করেন বাবা বিশ্বনাথকে। মানত করেন ওর আরোগ্যের জন্য—সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনের জন্য। ভাবতে ভাবতে এক সময় নিজেও তন্দ্রায় ঢলে পড়েন।

## বারো

সুচরিতাকে নিয়ে দাদু কাশীতে আছেন আজ সাত দিন। ইচ্ছে ছিল, বাবা বিশ্বনাথের চরণে অর্ঘ্য দিয়ে চুনার চলে যাবেন। কিন্তু একদিন একদিন করেও সেটি আর হচ্ছে না। চুনার যাওয়া আদৌ হবে কি তা বাবা বিশ্বনাথই জানেন।

কাশীতে পৌঁছুবার পরের দিনই খবর পেয়ে অনিতা আসে—সঙ্গে লিলি। দাদু শুধু একা সুচরিতার দাদুই নন—অনিতারও। লিলিও দাদুকে বশ করে ফেলেছে। ওদের এতদিন দূরে রেখে দাদু যেন

অত্যাচারই করে ফেলেছেন। লিলির সরলতায় দাত্থ মুগ্ধ। সুচরিতাও লিলিকে পেয়ে খুব খুশী। বুঝতে পারে না কে বেশী আপনার জন—লিলি না অনিতা? অনিতা আপন পিসতুতো বোন—রক্তের সম্বন্ধ। কিন্তু লিলি যে সামান্য এ ক'দিনেই হৃদয় জুড়ে আসন বিছিয়ে নিয়েছে। অনিতা যদি আপনজন হয় লিলি তবে আপনতম। অনিতা গুরুগম্ভীর। ওকে শ্রদ্ধা করা যায়। কিন্তু লিলি সাদাসিধে প্রাণ চঞ্চল। হাসতে জানে হাসাতেও জানে। লিলিই সুচরিতার সকল ভাবনা দূর করে দিয়েছে। সুচরিতা লিলিকে পেয়ে যেমন খুশী হয়েছে দাত্থ তার চেয়েও বেশী খুশী হয়েছেন লিলির সান্নিধ্যে সুচরিতাকে খুশী দেখে। সুচরিতা এখন তো সম্পূর্ণ ই স্বাভাবিক। বাবা বিশ্বনাথ সত্যি তা'হলে এতদিন পরে মুখ তুলে চেয়েছেন। সোনার প্রতিমা অদৃশ্য রাহুর দৃষ্টিতে ঝলসে গিয়েছিল। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, ঘুম নেই, হাসি নেই। কাশীতে না এলে হয়তো একদিন···না না, বেঁচে থাক লক্ষ্মী দিদি আমার!···দাত্থর চোখে জল আসে।

সুচরিতা চুনারের কথা হয়তো ভুলেই গেছে। অথচ বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে চুনারই ছিল ওর কাছে স্বপ্ন-মায়া। দাত্থও চুনারের কথা মুখে আনেন না। কি দরকার ওর ভৌগলিক স্বাস্থ্য-নিবাসের? যার শরীর যেখানে সারে সেইটেই তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য-নিবাস। সুচরিতার তো এখানেই আশাতীত উন্নতি হচ্ছে। তবে আর দৌড়-ঝাঁপ করে লাভ কি? এ বরং ভালই হয়েছে। সুচরিতাও সুস্থ হচ্ছে আমারও প্রত্যহ বাবার চরণ দর্শন হচ্ছে।···দাত্থ দীর্ঘ যাতনার পর স্বস্তির হাঁপ ছাড়েন।

ডক্টর দাশগুপ্ত পরের পরদিনই সস্ত্রীক আসেন দাত্থকে আমন্ত্রণ জানাতে। দাত্থ ওঁদের দু'জনকেও স্নেহের ডোরে বাঁধেন। নিজেও বাঁধা পড়েন। কিন্তু আস্তানা ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী হন না। আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার তো কোন উপায়ই নেই।

তীর্থক্ষেত্রে এসে কারও দেওয়া জলবিন্দুও গ্রহণ করার রীতি নেই। বাবা বিশ্বনাথ মুখ তুলে চেয়েছেন। কোন রকমেই এ সুফল উনি নষ্ট হতে দিতে পারেন না। সুচরিতার মুখ চেয়েই তা পারেন না। অবশ্য ডক্টর দাশগুপ্ত কিংবা শ্রীমতী দাশগুপ্ত কাকেও উনি ক্ষুণ হতে দেন না। এখান থেকে চুনার রওনা হয়ে গেলেই নিয়ম-তান্ত্রিক তীর্থ ত্যাগ ঘটবে। বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শনের বাসনা আজীবন থাকলেও তীর্থ-ব্রত এখানেই সম্পূর্ণ হবে। সুতরাং চুনার থেকে ফেরার পথে যখন আবার আসবেন তখন ওদের পরিবারের অতিথি হতে কোন বাধা নেই। এবং তাই হবেন উনি'।

নীতির কথা যা-ই হোক, কারও ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত হানার মতো মনোবৃত্তি ডক্টর দাশগুপ্তর নেই। দাদুর যুক্তি খুশী মনেই মেনে নেন ওঁরা। প্রীতির সম্পর্ক মধুর হতে মধুরতম হয়ে ওঠে। আহার বিহার না চললেও দাদু প্রায় প্রত্যহ একবার করে ওদের সকলকে দেখে আসেন। মিষ্টি কথার জাদুতে মাতোয়ারা করে তোলেন সকলকে। লিলির তো কথাই নেই। ওঁরা দু'জনে এসেও দাদুকে প্রায়ই দেখে যান। সুবিধা অসুবিধার তদারক করেন। দাদুকে পেয়ে সকলেই খুশী।

খুশী দাদুও। বর্ধমানে দিনরাত শুধুই জ্বলছিলেন। বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় এতদিন পরে আবার প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন। সুচরিতাকে দেখে এখন আর কেউ রুগ্ন বলতে পারবে না। চেহারায় আবার জুলুস এসেছে। সেই সঙ্গে মনের সজীবতা। ভগবান দিন দিলে সামনের অঘ্রানেই আবার বাড়িতে নহবৎ বসবে। বেচারা প্রশান্ত। দু'বার আঘাত পেয়েছে। লক্ষ্ণৌর ঠিকানায় ওকে একখানা চিঠি দেবেন স্থির করেন দাদু। এর আগে সুচরিতার বিষয় কিছুই জানান নি। দীর্ঘ অসুস্থতার কথা কি করে লেখা যায়? ওতে মনের ওপর রেখাপাত করতে পারে।. রোগা-বউ নিয়ে কে কবে সুখী হতে পেরেছে। কিন্তু এখন তো সুচরিতা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। কাশী থেকে লক্ষ্ণৌ কতটুকুই বা পথ। দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে প্রশান্তকে

চলে আসতে লিখলেই বা ক্ষতি কি? সকলে মিলে বেশ দিনকয়েক আনন্দে কাটানো যাবে। সুচরিতার বান্ধবী অনিতা লিলিকে দেখে নিশ্চয় খুব খুশী হবে প্রশান্ত। ডক্টর দাশগুপ্ত এবং শ্রীমতী দাশগুপ্তকে দেখেও। এত কাছাকাছি আছে—সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় থাকাই ভাল। বিয়ের পর প্রশান্ত যদি কাশীতে বদলী হয়ে আসতে পারে তাহলে ভাল সঙ্গী পাবে। এখন থেকে জানাশুনো থাকা ভাল।...দাদু প্রশান্তকে চিঠি লিখিতেই সাব্যস্ত করেন।

সুচরিতা আজ বেলা থাকতেই লিলিদের বাড়ি গেছে। ওরা সকলে মিলে কোথায় নাকি বেড়াতে যাবে আজ। তা যাক। সমবয়সীর সঙ্গে সমবয়সীর চলাফেরায় মনের সজীবতা বাড়ে। দাদু বাধা দেন না কিংবা নিজেও সঙ্গ নেন না। বিকেলের দিকে একাই উনি পথ ধরেন। বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে লাক্সার দিকে যাবেন। যদি ডক্টর দাশগুপ্তকে সঙ্গী পান ভাল নয়তো একাই এদিক ওদিক ঘুরে আসবেন। রুপো বাঁধানো লাঠিগাছা হাতে করে মন্থর গতিতেই পথ চলতে থাকেন দাদু। বাঙালী-টোলা থেকে লাক্সা অনেকটা পথ। কিন্তু দাদুর কোন ক্লান্তি নেই। বেশ লাগছে পায়ে হাঁটতে। সামনের চৌ-রাস্তার মোড়েই চৌথমলের মনোহারি পানের দোকান। মিঠে পান, সাচী পান, কাশীর পান, বাংলা পান যার যেমন রুচি। বড় বড় আয়না আর ফ্লুরোসেন্ট আলো দিয়ে অপূর্ব ভঙ্গীমায় সাজানো। আতরের শিশি আর জর্দা কিমামের কৌটো-গুলো ঝকঝক করছে। দেওয়ালের গায়ে বিচিত্রভাবে শোভা পাচ্ছে আধুনিক চিত্র জগতের দেবদেবীরা। আবার ঠাকুর-দেবতাও জন কয়েক রয়েছেন। পেট-মোটা সিদ্ধিদাতা গণেশ জীউ আর বাবা বিশ্বনাথই প্রধান। সঙ্গে খুদে জনকয়েক। রেডিও যন্ত্রটি রয়েছে সাইনবোর্ডের নীচেই ঝোলানো অবস্থায়। একের পর এক সমস্ত অনুষ্ঠানই বিরামবিহীনভাবে বেজে যাচ্ছে। পান রসের সঙ্গে সংগীত

রস জারিত হয়ে ক্রেতা সাধারণকে আকৃষ্ট করছে। এক আনা খিলির নীচে কোন পান নেই। কিন্তু তাতেও ভিড় অষ্টপ্রহর লেগেই আছে। দাদু এর আগে আরও দু'দিন এ পথে এসেছেন। দু'দিনই এক আনা খিলি পান খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন। আজও এক আনা দিয়ে এক খিলি পান কিনে মৌজ করে চিবাতে থাকেন। মিষ্টি রসে সমস্ত মুখ ভরপুর। পাশ ফিরে খানিকটা পিচ ফেলে আবার পথ চলতে যান। কিন্তু পারেন না। দুচোখ বিস্ফারিত করে দাঁড়িয়ে পড়েন। এ উনি কাকে দেখছেন! প্রশান্ত কি! কিন্তু...

দাদু মুখ খুলতে পারেন না। প্রশান্তও না। এ যে অভাবিত ব্যাপার। দাদু কবে কাশী এলেন! জানাশুনো কেউ দাদুকে খবর দিয়ে আনিয়েছেন কি? না না, তাই বা কি করে সম্ভব। কাশীতে এসে অবধি তো ও অনিতাদের ছাড়া আর কোন পরিচিত লোককেই দেখতে পায় নি। তা ছাড়া অন্যপর ওর মনের কথা জানবেই বা কি করে?...প্রশান্ত জড়তা কাটিয়ে ওঠে। খোলাখুলিই দাদুকে কুশল প্রশ্ন করতে যায়। কিন্তু তার আগে দাদুই মুখ খোলেন। বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠেই প্রশ্ন করেন, আরে, প্রশান্ত ভায়া যে! কবে এলে! তোমার বাবা বোধ হয় খবরটা দিয়েছেন।

দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে প্রশান্ত উত্তর করে, আজ্ঞে না। আপনাদের সম্বন্ধে বাবার কোন চিঠিপত্র পাই নি। আজ মাস কয়েক হলো আমি এখানে বদলী হয়ে এসেছি।

বলো কিহে! মাস কয়েক হলো এখানে আছ! দেখদিখিনি কি কাণ্ড! তুমি এখানে রয়েছ আর আমরা এখানে কিনা যাত্রী নিবাসে পড়ে মরছি! একটা খবরও দিতে পার নি ভায়া?

প্রশান্ত মহা ফাঁপরে পড়ে। এ সময়ে কি করে দাদুকে বাসায় নেওয়া যায়। লিলি অনিতার যে আসার সময় হলো। সঙ্গে নাকি আসছেন ওদেরই এক নূতন বান্ধবী। ওদের সঙ্গে সারনাথ বেড়াতে যেতে হবে...প্রশান্ত ইতস্তত করতে থাকে।

দাদু ওকে নিরুত্তর দেখে আবার প্রশ্ন করেন, তা বেশ, ভাল আছ তো ভায়া? বাসা কতদূর?

প্রশান্ত আর চুপ করে থাকতে পারে না। কুশলবার্তা জানিয়ে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই অভ্যর্থনা জানায়। এই তো কাছেই আমার কোয়ার্টার, চলুন না।

প্রশান্তর ভাবনা প্রশান্তর। দাদু সহজ সরল মানুষ বেশী আদর আপ্যায়নের ধার ধারেন না। প্রশান্তর আহ্বানে এক কথাতেই রাজী হয়ে যান। উল্লাসের সঙ্গেই সায় দেন, তা বেশ, চলো।

প্রশান্ত ভাবতে পারে নি দাদু এত সহজেই রাজী হয়ে যাবেন। তাই নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কি আর করা। এখন তো আর কোন রকমেই পাশ কাটানো সম্ভব নয়। সামান্য ভদ্রতা রক্ষার্থেই নয়। তবে হাতে এখনও কিছুটা সময় আছে। দাদুকে যদি এই ফাঁকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে দুকূলই রক্ষা হয়। প্রশান্ত হাতঘড়িটার ওপর এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে তাড়াতাড়ি একটা এক্কা ডাকে।

দাদু বাধা দিতে গিয়েও সফলকাম হন না। বেড়াতে বেরিয়েছেন উনি, সামান্য এটুকু পথ বেশ হাঁটতে হাঁটতেই যেতে পারতেন। খানিকটা গল্প করারও সুযোগ মিলতো।...কিন্তু কি আর করা। অগত্যা এক্কাতেই উঠে পড়েন। সন্ধ্যা দীপ জ্বলার আগেই দুজনে এসে কোয়ার্টারে পৌঁছান।

এক্কার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে প্রশান্ত সদরে এসে কলিং বেল টেপে। ভজহরি দৌড়ে এসে দোর খুলে দেয়।

দাদুকে দেখে বিস্মিত হয় ভজহরি। এর আগে কখনো ওঁকে দেখে নি ও। হয়তো বাবুর দেশ গাঁয়ের লোক হবেন। কে জানে, কর্তাবাবুও হতে পারেন। ভজহরি ছুটে এসেছিল ছুটে গিয়েই চায়ের জল বসিয়ে দেয়।

প্রশান্ত খুশীই হয়। ভজহরি ঠিক কাজই করছে। তাড়াতাড়ি চা জলখাবার খাইয়ে দাছুকে বিদায় করতে পারলেই রক্ষা।

দাছু ঘরে পা দিয়েই আহ্লাদে ফেটে পড়েন, বা, চমৎকার কোয়ার্টার পেয়েছ তো ভায়া! তোমার ভৃত্যটিও বেশ। বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে। কথায় কথায় এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে থাকেন দাছু। ফুল-বাগানটার দিকে তাকিয়ে আরও খুশী হন। সুচরিতার মুখখানাই ভেসে ওঠে। ফুটন্ত ঐ গোলাপটার মতোই ঢল-ঢলে মুখশ্রী সুচরিতার। প্রশান্তর পাশে ওকে মানাবে বেশ। পরম সুখেই ঘর-সংসার করতে পারবে। যে ফুল ভালবাসে সে নারীর মর্যাদাও দিতে পারবে।...ভাবতে ভাবতে বিহ্বল হয়ে পড়েন দাছু। খুশীর দমকে উচ্ছ্বাস জানান, ভায়ার দেখছি আয়োজনের ত্রুটি নেই। শুধু যা লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পদক্ষেপের অপেক্ষা। তা তিনিও এলেন বলে, কথায় কথায় সুচরিতার আগমন বার্তাই জানাতে যাচ্ছিলেন দাছু। কিন্তু কি জানি কেন শেষ পর্যন্ত চেপে যান। হয়তো মগজে সহসা কোন নতুন ফন্দীই পাক দিয়ে ওঠে। হয়তো কিঞ্চিৎ মজার খেলাই খেলতে চান। কথা শেষ করে মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন দাছু।

অন্য সময় হলে হয়তো প্রশান্ত দাছুর রসিকতায় পুলক বোধ করতো। কিন্তু এখন ওর হাতে এতটুকু সময় নেই। শুধু ঠোঁটের কোণের শুষ্ক হাসি দিয়েই দাছুর রসিকতার জবাব দেয়।

ভজহরি ততক্ষণে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। আজ আর ওকে বাজারে ছুটতে হয় নি। অনিতারা আজ এখানে চা জলখাবার খেয়ে সারনাথ যাবে। সুতরাং আয়োজনের ত্রুটি নেই।

ভজহরির তৎপরতায় প্রশান্ত স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে। দাছুকে আর অধিকদূর অগ্রসর হতে না দিয়ে চায়ের টেবিলে আহ্বান জানায়। এক ফাঁকে হাতঘড়িটার ওপরও চোখ বুলিয়ে নেয়।

চা দাছুর প্রিয় পানীয় হলেও এক্ষেত্রে উনি নির্লোভ। তীর্থ ক্ষেত্রে কারো কিছু উনি ছোঁবেন না। তাছাড়া কিছু আগে বাসা

থেকেই চা-পর্ব সেরে এসেছেন। দাছু বাগানের ওপর দৃষ্টি রেখেই পাশ কাটান, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন হে ভায়া! যাও—হাত-মুখ ধুয়ে এসো। ভারি সুন্দর ডালিয়া ফুটেছে হে।...

প্রশান্ত এর পর কি করতে পারে ভেবে পায় না। আবার এক-বার ঘড়ির দিকে তাকায়।

দাছু অন্যমনস্ক থেকেই বাধা দেন। সে কি হে, তুমি কি এক্ষুনি কোথাও বেরুবে নাকি! বারে বারে ঘড়ি দেখছ!

প্রশান্ত কি করে স্থির করতে পারে না। দাছুর প্রশ্নে মগজ খোলে। তৎপরতার সঙ্গেই উত্তর দেয়, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকে এক্ষুনি একবার পি. এম. জি সাহেবের বাসায় যেতে হবে।

তা বেশ তো, তুমি না হয় চা জলখাবার খেয়ে ঘুরে এসো। আমি বরং ভজহরির সঙ্গেই—

মুখের কথা শেষ করতে পারেন না দাছু। অনিতা লিলি ও সুচরিতা এসে ঘরে ঢোকে।

দাছু চোখ তুলে চাইতেই বিস্মিত হন। কিন্তু প্রশান্ত বোধ হয় দু'চোখে সর্ষে ফুল দেখে। এ ও কাকে দেখছে! এ মুখ কি এর আগে আর কখনো দেখেছে!...দুশ্চিন্তায় ঘুরপাক খেতে থাকে প্রশান্ত।

দাছু ততক্ষণে বিস্ময় কাটিয়ে মুখর হয়ে ওঠেন, কি ভায়া, পি. এম. জি সাহেবের ওখানে পৌঁছতে কি দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

প্রশান্ত জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। অনিতা সুচরিতাও না। কিন্তু লিলির সে বালাই নেই। দাছুকে সরাসরি প্রশ্ন করে, আপনি এখানে দাছু?

মুচকি হেসে দাছু উত্তর দেন, আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই থাকি দিদিভাই। ভেবেছিলে, লুকিয়ে লুকিয়ে জল খাবে, একাদশীর বাবাও টের পাবে না। কিন্তু দেখলে তো—

লিলি মুখ থেকে কথা লুফে নিয়ে বাধা দেয়, উঁহু-হু, ব্যাকরণ ভুল

হলো মশাই। আপনি কেন একাদশী হতে যাবেন। আপনার বরং একাদশে বৃহস্পতি। সত্যি, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই হাজির আছেন হুজুর।—খাবার দেখিয়ে কটাক্ষ করে লিলি।

দাদু সমতা রেখে জবাব দেন, কিন্তু কাজটা বোধ হয় ভাল করি নি দিদিভাই। দেখছো না, আর একজনের মুখখানায় কেমন আষাঢ়ের মেঘ জমেছে। প্রশান্তকে লক্ষ্য করেই টিপ্পনী কাটেন দাদু।

লিলি দাদুর হয়ে সায় দেয়, সত্যি, প্রশান্তদা আপনার কি হলো? হঠাৎ এত গুরুগম্ভীর?

প্রশান্ত উত্তর দেবার আগে দাদু বলেন, গুরুগম্ভীর না হয়ে উপায় আছে দিদিভাই। উনি পি. এম. জির ওখানে যাচ্ছিলেন, আমি এসে দিলুম বাধা, তার ওপর আবার তোমরা।

আপনি বেশ লোক তো প্রশান্তদা। আমাদের নেমন্তন্ন করে গা ঢাকা দিচ্ছিলেন।—লিলির কথায় কিঞ্চিৎ শ্লেষ ঝরে পড়ে।

উত্তরে দাদু বলেন, না দিদিভাই, গা ঢাকা দেবার ওর দরকার হবে না। স্বয়ং পি. এম. জি সশরীরে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পি. এম. জি উপস্থিত হয়েছেন।—বিস্মিতভাবেই লিলি পাশ ফিরে দরজার দিকে তাকায়।

হেসে দাদু বলেন, দরজার দিকে কি দেখছো দিদিভাই? পি. এম. জি যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, সুচরিতাকে দেখিয়ে ইঙ্গিত করেন দাদু।

লিলি সেদিকে তাকিয়ে হোহো করে হাসতে থাকে—এই আপনার পি. এম. জি।......

দাদু কিছুটা ধমকের সুরেই বাধা দেন, কি, হাসছো যে? পি. এম, জি মানে জানো?

অনিতা এতক্ষণ নীরব ছিল। দাদুর প্রশ্নে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বলে, আমি কিন্তু মানে জানি দাদু।

কি, বলো দিখি দিদিভাই!—দাহুর ওষ্ঠে চপল হাসি।

শুরে সুর মিলিয়ে অনিতা বলে, পি. এম. জি মানে পার্সোন্যাল মাস্টার জেনারেল। ঠিক বলেছি কিনা দাহু?

দাহু হাসির মাত্রা উচ্চগ্রামে চড়িয়ে উত্তর করেন, ছাটস্ রাইট—ছাটস্ রাইট। তুমি ঠিক মানে ধরতে পেরেছ দিদিভাই। আর তা পারবে না-ই বা কেন? ইউনিভার্সিটিতে পড়ছ আর এই সহজ কথাটার মানে জানবে না! লিলিটা একদম বোকা! কিচ্ছু জানে না।

লিলি সত্যি বোকা বনে যায়। অনিদি বলছে কি! এতদিন তাহলে কি বুঝে এল ও! দাহু অনিতা হুল্লুড়ে মাতলেও লিলি বোকার মতোই প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুচরিতা লজ্জায় রক্ত-রাঙা।

কিন্তু প্রশান্ত বোধ হয় দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। ওদের ত্বজনের হুল্লুড়ে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হতে থাকে। আজ ওর ত্বঃখ হয়, কেন ও স্বেচ্ছায় লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে বদলী হয়ে এল। লজ্জায় ক্ষোভে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয় ওর।

কিন্তু দাহু দমেন না। কণ্ঠে মাধুর্য রেখেই অনিতাকে বলেন, না দিদিভাই, তোমাদের পি. এম. জির দরবারে আমার মতো পিয়ন-পেয়াদাকে মানায় না। আমি চললুম, কয়েক পা এগিয়ে যান দাহু দরজার দিকে।

অনিতা বাধা দেয়। প্রশান্ত দিশেহারা হয়ে পড়লেও ওকে বেশ উৎফুল্লই দেখায়। প্রশান্তর হয়ে ও-ই দাহুকে অভ্যর্থনা জানায়, চললুম মানে? এগুলোর সদ্-ব্যবহার করতে হবে না?—চায়ের টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করে অনিতা। বেশ হাসি-খুশীই দেখায় ওকে।

দাহুও সমতা রেখেই উত্তর করেন,সদ্-ব্যবহার তোমরা সজ্জনেরাই করো ভাই, আমারটা তোলা রইল।

জানিসই তো, দাহুর এসব কিছুই চলবে না। উনি হলেন তীর্থ-বাসী, লিলি দাহুকে সমর্থন করে।

ঠিক তাই। আর এই জন্যই ছোড়দিকে আমার খুব পছন্দ। ও আমার মনের কথা বোঝে, আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে ওঠেন দাদু।

সুযোগ পেয়ে অনিতা টিপ্পনী কাটে, তাই নাকি! বেশ, তা হলে—

আর তা'হলেতে কাজ নেই। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—তোমরা এখন বসে পড়ো, অনিতাকে বাধা দিয়ে প্রায় দরজার কাছাকাছি এসে পড়েন দাদু।

প্রশান্ত বোধ হয় এতক্ষণ পরে নিজের ত্রুটি ধরতে পারে। মনে যাই থাক দাদুকে সমাদর না করে পারে না। সবিনয়েই অনুরোধ করে, চা পানে তীর্থ-ফল নষ্ট হবে না। আপনি আসুন, টেবিলের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশান্ত।

খুশী হয়ে দাদু বলেন, আমার জন্য ভাবতে হবে না ভায়া। তাছাড়া তুমি যখন অভয় দিচ্ছ তখন তীর্থ দর্শন নিশ্চয় আমার সফল হবে। আর তা হচ্ছেও। তবে কি জানো ভায়া, সামান্য ক'টা দিনের জন্য মিছেমিছি আর নিয়মভঙ্গ করি কেন। তুমি বরং আমার দিদি-ভাইদের সঙ্গেই মিষ্টিমুখ করো। তোমার সৌভাগ্য কামনা করি, হেসে দাদু বিদায় নিতে যান। কিন্তু পারেন না।

অনিতা বাধা দেয়, বাঃ, আপনি বেশ লোক তো! কিছু খাবেন না বলে কি আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেও দোষ?

তোমরা বেড়াতে যাচ্ছ! কোথায়?—দাদু ঘুরে দাঁড়ান।

অনিতা চটুলতা রেখেই উত্তর করে, সারনাথ।

সারনাথ!—তা বেশ বেশ, হেসে কুটি কুটি হন দাদু।

অনিতা কৃত্রিম ক্রোধে বাধা দেয়, হাসছেন যে?

হাসছি, না—না, সারনাথেই তো আজ তোমাদের যাওয়া উচিত। তোমাদের দেবী শকুন্তলা যে আজ দীর্ঘদিন পর তাঁর সারনাথকে খুঁজে পেয়েছেন—সারনাথ যাবে বই কি! যাও, সকলে মিলে আজ সারনাথেই যাও, আমি চললাম আমার সারনাথের উদ্দেশ্যে, সুচরিতার

দিকে কটাক্ষ করে হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান দাদু। সকল তীর্থের সার বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শনই হবে এখন ওঁর প্রধান কাজ। আজ উনি প্রাণভরে সুচরিতা আর প্রশান্তর জন্য প্রার্থনা করবেন। দাদু বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকেই এগিয়ে যান।

দাদু বেরিয়ে যান। প্রশান্ত ওর পথের দিকে চেয়ে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মনের কোণে কালবৈশাখীর ঝড় বইছে। হ্যাঁ, সৌভাগ্যের সুচনাই বটে! এমন সৌভাগ্য যে তার দাপটে কোথাও পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।…দাদুর শুভেচ্ছা-বাণী প্রশান্তর বুকে হুল ফোটাতে থাকে।

ঝড় অনিতার বুকেও বইছে। কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ ওকে বরং প্রফুল্লই দেখায়। প্রশান্তর আহ্বানের জন্য অপেক্ষা না করে ও নিজেই উদ্যোগী হয়ে সকলকে ডেকে নিয়ে গিয়ে টেবিলে বসে। নিজের হাতে লিকারের সঙ্গে দুধ চিনি মিশিয়ে সকলকে পরিবেশন করে। শুধু পরিবেশনই নয়, টুকরো টুকরো আমেজী কথায় সকলের মন ভরাতেও চেষ্টা করে।

সুচরিতা সত্যি আজ খুশী। কিন্তু মুখে ওর কোন কথা নেই। ও কিছুতেই লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। লিলিও যেন কেমন থিতিয়ে পড়েছে। ও যদি প্রাণ খুলে হাসতে পারতো তাহলে সুচরিতাকে হাসাতে পারতো। অনিতার চাপল্যে ও শুধু নিয়ম রক্ষা করেই চলেছে। কিছুতেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে না। প্রশান্ত তো কোন কথাই বলছে না। কুইনাইন গেলার মতোই সব কিছু সহ্য করে যাচ্ছে। ও ভেবে পাচ্ছে না, অনিতা কি করে এমন হাসতে পারছে। ও কি বুঝছে না, কি থেকে কি ঘটে যাচ্ছে?…অনিতার আচরণে বিরক্তিই হতে থাকে প্রশান্তর। সারনাথ ভ্রমণের উৎসাহ ওর আর বিন্দুমাত্রও নেই। পাশ কাটাতে পারলেই ও বেঁচে যায়। কিন্তু

মুশকিল হয়েছে সে উপায় নেই। অনিতার জন্যই নেই। অনিতাই আজ সকলের চেয়ে বেশী উৎসাহী। চা পর্ব শেষ হলে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই এক্কায় গিয়ে ওঠে প্রশান্ত।

## তেরো

রাত ন'টার কাছাকাছি লিলি অনিতা বাসায় ফেরে। এক্কা থেকে কোয়ার্টারের কাছে একা নেমে যায় প্রশান্ত। অনিতার অনুরোধেই যায়। মিছিমিছি দৌড়-ঝাঁপ করে লাভ নেই। ওরা একাকীই বাড়ি পৌঁছতে পারবে। প্রশান্ত আপত্তি করে না। নীরবেই অনুরোধ রক্ষা করে। হ্যাঁ, আজ ওর পক্ষে চুপচাপ নেমে যাওয়াই সঙ্গত। অনিতার কাছে আজ ও অপরাধী—প্রতারক। কিন্তু অনিতার ভদ্রতার তুলনা হয় না। প্রতারক জেনেও নিঃশব্দে কেমন ও ভদ্রতা রক্ষা করে গেল। অন্য কোন মেয়ে হলে হয়তো কুরুক্ষেত্র করতো। ডক্টর দাশগুপ্তর কাছে ওর শিক্ষা। আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করার মনোবৃত্তি হয়তো ওর গড়ে ওঠে নি। বেচারা। সবকিছু ঢেকে চলতেই চেষ্টা করেছে। ভ্রমণের আনন্দ দানেও চেষ্টার ত্রুটি করে নি। স্বেচ্ছায় নিজেই নিয়েছে প্রধান ভূমিকা। হাসি তামাসা উচ্ছলতা কিছুই বাদ যায় নি। কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে ওরই মধ্যে চোখে পড়বে ওর অন্তর্নিহিত মর্মবেদনা। প্রবাল দ্বীপে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল—প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। প্রশান্ত নিঃশব্দেই এক্কা থেকে নেমে যায়। বিদায় সম্ভাষণ জানাতেও আজ ওর ভুল হয়।......

অনিতা সে ভুল শুধরে নেয়। অনুসূয়া প্রিয়ম্বদার মতোই হালকা রসিকতায় আবার ওকে হাসাতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রশান্তর ওষ্ঠে সে ঢেউ লাগে কিনা বোঝা যায় না। অন্যদিকে সুচরিতার

বুক ভরে ওঠে। যেন কস্তুরী-মৃগীই ও। নিজের সুবাসে নিজেই মাতোহারা। প্রশান্তর গাম্ভীর্য আর নীরবতায় দমে না। ভেবে নেয়, এ নিছক লজ্জা—বাক্‌পটুতার অভাব। বরাবরই তো মুখ-চোরা উনি। অনিতা লিলির সঙ্গে কথায় এঁটে উঠতে পারলেন না। ভ্রমণের আনন্দে ডগমগ হয়ে বাসায় ফেরে সুচরিতা। দাদু ওর খুশীর পালে আরও খানিকটা অনুকূল হাওয়া বইয়ে দেন। সুচরিতা সত্যি আজ রোগ মুক্ত। আর ওর মাথা ঘুরবে না। তেমন ভয়ও আর কখনো করবে না।

সুচরিতা নেমে গেলে একায় বসে শুধু লিলি আর অনিতা। এ পর্যন্ত বেশ বাগ্‌ময়ীই দেখা গেছে অনিতাকে। কলের পুতুলই যেন পরিমিত খেলায় মেতেছিল। সহসা দম ফুরিয়ে যায়। মুখরা অনিতা এবার মৌন। নেশা কেটে গেলে সাধারণ মানুষের যেমন অবসাদ আসে ওর দেহও তেমনি অবসন্ন। বাঙালী-টোলা থেকে ওদের বাসার দূরত্ব এমন কিছু নয়। কিন্তু এই সামান্য পথটুকু চলতেই হাঁপিয়ে ওঠে ও। পাঁজরার একখানা হাড়ই যেন কে খুলে নিয়েছে।

লিলি এ পরিস্থিতির জন্য তৈরীই ছিল। চায়ের আসর থেকে সারনাথ ভ্রমণ কোথাও ও প্রাণখুলে হাসতে পারে নি। প্রশান্ত আর অনিতার কথাই ভেবেছে। অনিতা প্রশান্তকে নিয়ে কি ভাবছে তা অনিতাই জানে। কিন্তু ও প্রশান্তকে সামান্য প্রতারক ভাবতে পারে না। ওর মনে হয় ওদের মধ্যে কোথাও একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। কিন্তু কি সে ফাঁক?···গাড়ি প্রায় মাঝ পথে এসে পড়ে। অনিতা বাইরের দিকে মুখ করে নিঃশব্দে বসে আছে। লিলি গাম্ভীর্য রেখেই প্রশ্ন করে, কি ভাবছিস?

লিলির প্রশ্নে চমকে ওঠে অনিতা। ও কি ধরা পড়ে গেল লিলির কাছে? না না, তা হতে পারে না। সুচরিতা প্রশান্তর চলার পথ স্থিরিকৃত। ও সে পথে কাঁটা হতে পারবে না। না-না-না।···অনিতা

তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে উত্তর দেয়। হালকা কথার লহরই ঝরে পড়ে ওর কণ্ঠস্বরে, কি আবার ভাববো। একা একা কতক্ষণ আর বকা যায়। তুই তো আজ মুখ বন্ধ করেই আছিস।…

লিলি তবু হালকা হতে পারে না। গাম্ভীর্য রেখেই বলে, আমাকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করিসনে। আমি জানি তুই ভাবছিস।

জানিস তো জানিস। তবে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন, অনিতা আবার মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

লিলিও মুখ ঘুরিয়েই বসে থাকে। এক্কা একটানা ছুটে চলেছে। বাঁক ঘুরলেই ওদের বাসা।

লিলি দম রাখতে পারে না। গলার স্বর খাদে নামিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বলে, প্রশান্তদাকে আমি বুঝতে পারলুম না ভাই।

অনিতা এবার হেসে ফেলে। হালকাভাবেই বলে, সেকি রে! তুই সাইকোলজির স্টুডেণ্ট, তোর আবার গোলমাল কিসের?

লিলি কোন উত্তর দিতে পারে না। শুধু ছ'চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকে অনিতার দিকে।

এক্কা এসে ততক্ষণে সদরে লাগে। নামতে নামতে অনিতা বলে, সব মানুষ যেমন পাঁচভূতে গড়া উনিও ঠিক তাই—বুঝলে বোনটি। হাসতে হাসতেই এক্কার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ছজনে বাড়ির ভেতরে এসে ঢোকে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি যেন আর ফুরোয় না। পায়ে কে যেন পাথর বেঁধে দিয়েছে অনিতার।

মনে যাই থাক সকলের সঙ্গে প্রতিদিনের মতো খাবার টেবিলে বসতে হয় অনিতাকে। লিলিও পাশেই বসে। প্রশান্তর বাসায় এমন কিছু খায় নি। সামান্য চা ও কিছু জলখাবার। তাও কোন্ সে বিকেলে। সারনাথে হাঁটাহাঁটিও বড় একটা কম হয় নি। চন্‌চনে খিদে হবারই কথা। জঠরের আগুন হয়তো দাউদাউ করেই জ্বলছে কিন্তু কিছুতেই খেতে পারে না অনিতা। বুকে যে পাষাণ চাপা

রয়েছে। জঠরের অগ্নি-শিখা রসনায় এসে পৌঁছতে পারছে না। রসনা শুষ্ক—তিক্ত। এতটুকু খাবার ইচ্ছে নেই। সারাটা বিকেল অভিনয় করে কেটেছে। খাবার টেবিলেও প্রাণপণ সেই চেষ্টাই করে। কিন্তু পারে না। ডক্টর দাশগুপ্তর চোখে ধরা পড়ে যায়। উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই প্রশ্ন করেন ডক্টর দাশগুপ্ত, তোর কি শরীরটা ভাল নেই মা? কিছুই যে খাচ্ছিস নে?

অনিতা খাবারগুলো নিয়ে বৃথাই নাড়াচাড়া করছিল। হয়তো অন্য মনস্ক হয়ে প্রশান্তর কথাই ভাবছিল। ডক্টর দাশগুপ্তর কথা হয়তো কানেই ঢোকে না। তাই উত্তরও কিছু করে না।

লিলি তাড়াতাড়ি সামলে নেয়, খাবে কি, প্রশান্তদার বাসায় তো কম গেলে নি। তাছাড়া দৌড়-ঝাঁপও বড় একটা কম করে নি। হয়তো—

মুখের কথা শেষ করতে পারে না লিলি ডক্টর দাশগুপ্ত লুফে নেন, বেশ তো তাহলে আর মিছিমিছি বসে আছিস কেন? হাত ধুয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়গে যা। ভাবিস্ নে কোন কিছু ফেলা যাবে। এ শর্মা যখন রয়েছে—হে-হে-হে···

ডক্টর দাশগুপ্তর সঙ্গে সকলেই হোহো করে হেসে ওঠে। শুধু হাসতে পারে না অনিতা। চেষ্টা করেও পারে না। ঠোঁটের কোণ দুটো সামান্য বিকশিত হয় মাত্র।

অনিতা লিলি এক ঘরে থেকে লেখাপড়া করে। দু'জনে একত্র শোয়। আজও তার ব্যতিক্রম হয় না। এ বেলাটা সম্পূর্ণই ছুটি ওদের। অন্যদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও আজ সকাল সকালই বিছানা নেয়। সারনাথে ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি নেহাত কম হয় নি। বিছানায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই লিলি ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু অনিতার চোখে ঘুম নেই। মাথার ভেতরে যেন আগুনের হলকা ছুটছে। প্রশান্ত হঠাৎ ওর সাজানো বাগানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

ছি ছি ছি, মানুষ এমনও হয়। প্রথম দিনের ভ্রমণ-সঙ্গী হিসেবে না হয় মুখ খোলবার কারণ ছিল না। কিন্তু তারপর! পর পর যে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তখনও কি মুখ বুজে থাকতে হবে? আজ তো মুখোশ সবটাই খুলে গেল! সুচিকে তো অস্বীকার করতে পারলেন না। তবে?...অনিতা আর ভাবতে পারে না। দমবন্ধ হয়ে আসে ওর। অশ্রুতে ভেসে যায় দু'গণ্ড। কাকা কাকীমা কি ভাববেন? ওঁরা তো স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে গিয়েছেন। ছাত্রের উপযুক্ত কাজই করেছেন বটে...বিছানায় যেন হুল ফুটছে। পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে আসে অনিতা। লিলিটার ঘুম ভেঙে গেলে আবার জ্বালাতে শুরু করবে। চুপচাপ এসে রেলিং ধরে দাঁড়ায়। শুক্লা সপ্তমী। চাঁদ অনেকক্ষণ হয় ডুবে গেছে। আকাশ জুড়ে ঘন অন্ধকার। মিট-মিট করে জ্বলছে শুধু অগণিত নক্ষত্র। ওরা কি দাঁত বার করে বিদ্রূপ করছে ওকে?...আকাশের কোণ থেকে দৃষ্টি মাটির দিকে ফিরিয়ে নেয় অনিতা। লাক্‌সার মানুষ সব ঘুমে অচৈতন্য। গাড়ি ঘোড়া একটিও রাস্তায় নেই। শরতের অন্তর্দশা। কাশীতে শীত পড়তে শুরু হয়েছে। গায়ে একটা কিছু চাপা না দিয়ে ঘুমুবার উপায় নেই। কিন্তু ও যে ঘামে নেয়ে উঠেছে! গা থেকে শাড়ীর আঁচলটা ফেলে দেয় অনিতা। এক দৃষ্টে আবার চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। সন্ধ্যাতারাটা এবার যেন ওর চোখে উজ্জ্বলই দেখায়। মনোহর জ্যোতিতেই জ্বলছে আলোর-দ্যুতি। কিন্তু ওকে তো নাগালের মধ্যে পাবার নয়। ওকে দূর থেকে দেখেই চোখ জুড়োতে হবে। অনিতা দু'চোখ ভরে দেখতে থাকে আলোর দ্যুতিকে। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়। গায়ের উত্তাপ আর নেই। লুটিয়ে পড়া আঁচলটা তুলে আবার গায়ে দেয়। মুগ্ধ নেত্রেই চেয়ে থাকে। সহসা পুব গগনের কোণ থেকে খসে পড়ে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র। মাটির আকর্ষণে দ্রুত ছুটে আসে আলোর দ্যুতি। বুকে তার অদম্য তৃষ্ণা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নিমেষের চমক মাত্র। তারপর শুধুই অন্ধকার—

সুচিভেদ্য অন্ধকার। সারা জীবনব্যাপী অন্ধকার। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রশান্ত ওর জীবনে ফুরিয়ে গেছে। সে আর ওর নয়—সুচরিতার হৃদয় বল্লভ সে। ওর ছোট বোন সুচরিতার। কিন্তু প্রশান্ত সব জেনে শুনে তবু কেন ওর সঙ্গে এ অভিনয় করল? লিলি ঠিকই বলেছে, ওকে বোঝা যায় না। না না, বোঝাই বা যাবে না কেন? ও লম্পট, প্রতারক, ধূর্ত…অনিতার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে।

ঘুম প্রশান্তর চোখেও নেই। অনিতার মতো একই যাতনা ওকে দহন করছে। কিন্তু ওর কি দোষ! স্বাভাবিকভাবেই তো ও সুচরিতাকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল। প্রশস্ত চিত্তে দু'বার বাহু বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বিধাতা—নিষ্ঠুর বিধাতা দু'বারই বাদ সাধলেন। তারপর তো একান্ত নাটকীয়ভাবেই ওর জীবনে অনিতার আবির্ভাব। শুধু আবির্ভাব নয় ওর অজ্ঞাতসারেই মোহময়ী হৃদয়ের বেদীমূলে স্থান করে নিয়েছিল। এখন তো ও সুপ্রতিষ্ঠিতা। আর সুচরিতা? ও তো শৈশবের পুতুল খেলার সাথীমাত্র। কিন্তু অনিতাও যে ওর যৌবন সহচরী। জীবনের কোন স্বপ্ন যদি ও কোনদিন দেখে থাকে তবে সে অনিতাকে নিয়েই। ঘর বাঁধার স্বপ্ন—ফুল ফোটাবার স্বপ্ন—স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন।… কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা। এখানেই বাদ সাধলেন। এখন তো ঘৃণ্য প্রতারক ছাড়া ওর আর কোন পরিচয় হতে পারে না। সুচরিতাই কি ওকে ক্ষমা করতে পারবে? প্রশান্ত বুঝিবা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। ওর জীবনের সবটাই হয়তো অন্ধকার।

কাল সর্বস্বহারী। তিনদিন তিন রাত ঘুমুতে পারে নি অনিতা। কারো সঙ্গে প্রাণখুলে কথা পর্যন্ত বলে নি। পালিয়ে পালিয়ে ফিরছে। প্রশান্তর অবস্থাও তাই। দুজনের মধ্যে এর ভেতরে আর দেখা হয় নি। প্রশান্ত লজ্জায় এগিয়ে যেতে পারে নি। অনিতা রুদ্ধ আবেগে নিষ্প্রভ। ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া-আসার পথটুকু চলতেও ওর ভয় করে। যদি অতর্কিতেই প্রশান্তর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কি করবে ও তখন? না, প্রশান্তর কাছ থেকে কোন কৈফিয়ত ও শুনতে পারবে না। কোন কৈফিয়ত দিতেও পারবে না।...

অনিতা ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু সময়ের এই বিবর্তনেই হৃদয়ে আবার বল ফিরে পায়। সৎ হোক আর অসৎ হোক প্রশান্ত সুচরিতার। —একান্তভাবেই সুচরিতার। না না, অসৎই বা হতে যাবে কেন প্রশান্ত! এতদিন ওকে দেখেছি, কোন দুর্বলতাই তো ধরা পড়ে নি। বেচারা, উচ্ছ্বাসময় জীবনে হয়তো লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারে নি। শিল্পী সাহিত্যিকের জীবনে এ রকম নজীর অঢেল। হয়তো দুটি ভ্রমরকেই ও সমভাবে মধু বিতরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ও তো জানে না, হৃদয়-মধু একজনকেই দেওয়া যায়। দুজনকে নয়। দাতা পারলেও গ্রহীতা কোন মতেই তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। কারো ভালবাসায় কখনও ভাগ বসানো যায় না। প্রশান্ত একান্তভাবেই সুচরিতার। ওর হাতেই ওকে নিঃশেষে তুলে দিতে হবে।...তিনদিন তিনরাত ভাবার পর পথ খুঁজে পায় অনিতা। ওর প্রাণগঙ্গায় যত বড় ভাঙনই লাগুক না কেন প্রশান্তকে ওর ফিরিয়ে দিতে হবেই। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

পালিয়ে ফিরছিল অনিতা, আজ প্রশান্তর কোয়ার্টারে যেতে মনস্থির করে। আজ আর ওর কোন রকম সঙ্কোচ নেই। প্রশান্তর সঙ্গে

দেখা হলে হেসেই কথা বলবে। কোন কৈফিয়ত যদি চায় তাও প্রাণ খুলেই দেবে। এ ক'দিন আসতে পারে নি তার কারণ আর কিছু নয় —ইউনিভার্সিটিতে ব্যস্ত ছিল। হ্যাঁ, শুধু ব্যস্ততার জন্যই আসতে পারে নি। নয়তো আবার কি! না না, রাগ আবার কিসের।··· একটু মিথ্যে হয়তো বলা হবে। তা হোক, তবু তো প্রশান্ত লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। বেচারা, কি অসুবিধাতেই না পড়েছে।

ক্লাসে হাজিরা দিয়েই বেরিয়ে পড়ে অনিতা। একা। আজ আর লিলি সঙ্গে নেই। লক্ষ্য সরাসরি প্রশান্তর কোয়ার্টার। এ ক'দিনে ঘর-দোরের না জানি কি হাল হয়েছে। প্রশান্ত অফিস থেকে ফেরার আগে সব কিছু গুছিয়ে ফেলতে হবে। ভজদার সঙ্গে থেকে ভাল কিছু খাবারও তৈরী করে ফেলা চাই। আত্মাভিমানে বেচারার হয়তো এ ক'দিন ভাল করে খাওয়াই হয় নি। ছি ছি ছি, শুধু শুধু জুলুম করা হয়েছে ওর ওপর। বিদেশে কে আর আছে ওর ?··· অনিতা ভাবতে ভাবতে দ্রুত পা চালিয়ে দেয়। অনেকটা পথ এসে ভাবরাজ্যে নতুন পাক লাগে। না, সোজাসুজি প্রশান্তর কোয়ার্টারে গিয়ে কাজ নেই। আগে সুচির ওখানে যাওয়াই সবদিক থেকে সুবিধে। তিনদিনের অদর্শনে হয়তো হাঁপিয়ে উঠেছে ও। হ্যাঁ, ওর চোখে তো এখন শুধু স্বপ্ন আর স্বপ্ন। ঘর বাঁধবে—রাণী হবে—প্রজাপতির পাখায় ভর করে উড়ে চলবে।··· প্রশান্তর কোয়ার্টারে না গিয়ে সুচরিতার বাসাতেই এসে ওঠে অনিতা।

দুপুরে ভাত-ঘুম দিয়ে উঠে জানালায় বসে ছটফট করছিল সুচরিতা। লিলি অনিতার পথ চেয়েই বসে আছে। রোজই বসে থাকে। সেই থেকে দাদুর সঙ্গে কিছুতেই আর বেরোয় না। পাছে যদি ওরা এসে ফিরে যায়। অনুসূয়া প্রিয়ম্বদার সাহায্য ব্যতিরেকে দুষ্মন্তের সাক্ষাৎ কি করে সম্ভব ? একা একা যে লজ্জা করে।··· জানালায় বসে ভাবছিল সুচরিতা, অনিতাকে পেয়ে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে। আহ্লাদে আটখানা।···

অনিতাকেও মহাখুশী দেখায়। বড় বাঁচা বেঁচে যায় ও। দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য আর দাছুকে কৈফিয়ত দিতে হয় না। উনি এখন ভীষণ ব্যস্ত। পাণ্ডাজীর এখানে ইতিমধ্যে আরও জনকয়েক সমপর্যায়ের বন্ধু জুটেছে ওঁর। উনি এখন ওদের সঙ্গে দাবা খেলাতেই মত্ত। বিকেলের দিকে এখন আর বড় একটা বেরুচ্ছেন না। শুধু সন্ধ্যা-আরতির সময়েই যা একবার করে মন্দিরে যান।

দাছুকে পাশ কাটিয়ে নির্বিঘ্নে ওপরে উঠে আসে অনিতা। পায়ের শব্দে শুধু একবারটি উভয়ের মধ্যে চোখোচোখি হয়। কিন্তু সে এমন কিছু নয়। উনি এখন দাবা সামলাতেই হিমসিম। অনিতার দিকে ভ্রূক্ষেপ করার অবসর নেই।

সুচরিতা কি করবে ভেবে পায় না। ওর যে এখনও কিছুই হয় নি। অনিতা তো পৌঁছেই তাড়া দিচ্ছে। হন্তদন্ত হয়ে কলঘরে ছোটে। ফিরে এসে তাড়াতাড়িই তৈরী হয়ে নেয়। দাছুকে বলে ছ'জনে বেরিয়ে পড়ে ছটোর কাছাকাছি। দাছু যে কিসে সম্মতি দিলেন তা হয়তো খেয়াল করতেই পারলেন না। কিস্তিতে কিস্তিতে একেবারেই বেসামাল।

চৌরাস্তার মোড়েই বিখ্যাত ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারী—ফটোর দোকান। অনিতা সুচরিতাকে সঙ্গে করে ওখানে গিয়ে ওঠে। কোনরকম সঙ্কোচ না করে দোকানদারকে সুচরিতার একটা আবক্ষ ফটো তোলার জন্য বলে। সুচরিতাকে তাড়া দেয় তৈরী হয়ে নিতে।

তৈরী অবশ্য সুচরিতা বাসা থেকে হয়েই এসেছে। অভিসারের সাজ-সজ্জাই আজ ওর দেহে। লীলায়িত অপূর্ব ভঙ্গিমা।

দোকানদার প্রথমটা হকচকিয়ে যান। রূপের এমন রোশনাই জীবনে উনি কমই দেখেছেন। স্বর্গের দেবীই যেন কাশীধাম দর্শনে নেমে এসেছেন। মুহূর্তে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ক্যামেরায় হাত লাগান। সুচরিতাকে "মেক-আপ রুমে গিয়ে" কপালের ঘামটা মুছে আসতে অনুরোধ করেন।

সুচরিতা মহাখুশী। তবু অ-খুশীর ভান করে অনিতাকে জিজ্ঞেস করে, ফটো দিয়ে কি হবে?

দরকার আছে। তাড়াতাড়ি কর।—অনিতা ঠেলতে ঠেলতে ওকে 'মেক-আপ রুমে' নিয়ে যায়। নিজেই পছন্দ মতো সাজিয়ে দেয়।

সুচরিতা মেক-আপ রুমের বড় আয়নায় নিজের রূপ দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়। মুগ্ধ হয়ে নিজের মনেই ভাবতে থাকে, নিশ্চয় উনি আমার ফটো চেয়েছেন। হয়তো কোন বন্ধু-বান্ধবকে দেখাবেন। আমার কোন ফটোই তো ওঁর কাছে নেই। সেই কোন ছেলেবেলায় দুজনে গলা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম কুলতলায়। শুধু সেই ফটোখানাই হয়তো ওঁর কাছে আছে। কিন্তু সে তো ছোট্ট একটা ফ্রকপরা খুকুর ফটো।...

অনিতার শেষ তুলির টানে রূপকুমারী মোহময়ী হয়ে ওঠে। নিঃশেষে ধরা পড়ে সে রূপ ক্যামেরায়। দু'টাকা আগাম দিয়ে দু'জনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে আর্ট গ্যালারী থেকে। এক্কা ডেকে উঠে পড়ে প্রশান্তর কোয়ার্টারের পথে।

বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছে যায়। প্রশান্তর ফিরতে এখনও ঢের বাকী। ভজহরি এখন আর অপটু নেই। ঘরদোর বেশ গোছানোই আছে। অনিতাকে একটুও হাত ছোঁয়াতে হয় না। শুধু বাগান থেকে তুলে এনে একগুচ্ছ টাটকা ফুল ফুলদানীতে বদলে দেয়। হিটারে শুরু করে খাবার তৈরী। সুচরিতা ভজহরিও হাত লাগায়। রকমারী ভোজের আয়োজন চলে। সত্যি, তিন-চার দিন প্রশান্ত একরকম কিছুই খায় নি। ভজহরির মনেও শান্তি ছিল না। মুখ বুঝেই থাকতে হয়েছে ওকে। ভগবানকে ধন্যবাদ, আজ একটু কথা বলার সুযোগ জুটেছে। দিদিমণিরা যখন এসেছেন তখন বাবুও নিশ্চয় মুখর হয়ে উঠবেন। গান-বাজনা হাসি-তামাসার আবার স্রোত বইবে।...ভজহরির এতটুকু আলস্য নেই। দিদিমণিরা যে যা বলছে তক্ষুণি করে ফেলছে।

প্রশান্ত ফেরে সন্ধ্যা ছ'টায়। অফিস থেকে সকাল সকালই বেরিয়েছিল কিন্তু বাসায় ফিরতে উৎসাহ বোধ করে নি। কে আছে ওর বাসায়? তিনদিন তো কেটে গেল। কেউ তো একটা খোঁজ নিতেও এল না। লিলির তো কোন বাধা ছিল না। অনায়াসে আসতে পারতো। সুচরিতাই কি দাত্তুর সঙ্গে আসতে পারতো না? কিন্তু আসবে কেন? নিশ্চয়ই সব কিছু শুনেছে। দাত্তুও। নয়তো অত উৎসাহ এরই মধ্যে থিতিয়ে গেল কেন? বরাত —সবই বরাত। ভাগ্য-দেবতা পদে পদে বাদ সাধছেন। অবশ্য সুচরিতাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না। অপরাধ যদি কিছু হয়ে থাকে তো ওর কাছেই হয়েছে। ওর অভিমান শোভা পায়। কিন্তু অনিতা? ওর কি বলার থাকতে পারে? একবারও কি নিরালায় এসে কিছু জানার ছিল না ওর?···অফিস থেকে বেরিয়ে ভাবতে ভাবতে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে প্রশান্ত। একবার মনে হয়েছিল, ইউনিভার্সিটির পথে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখোমুখি দাঁড়িয়েই বোঝাপড়া করবে অনিতার সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উৎসাহ থাকে নি। এটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, স্বেচ্ছায়ই ওরা সকলে পাশ কাটাচ্ছে। কেউ ওরা আর ওকে চায় না। তবে আর লাভ কি?···

গঙ্গার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বিদায় বেলার আবীর রাগে দিবালোকের শেষ মুহূর্তটুকু ঘোষণা হচ্ছে। এর পরেই নেমে আসছে ঘোর অন্ধকার। অমাবস্যার সূচিভেদ্য অন্ধকার। প্রশান্তর হু'চোখ জলে ভরে যায়। আলোর শিখা জ্বলতে না জ্বলতেই ওর জীবনে অন্ধকারের সঙ্কেত ঘোষণা হচ্ছে। জীবন-ব্যাপী অন্ধকার। বেশ, তাই হোক। সরকার থেকে তো সব ব্যবস্থাই পাকাপাকি হয়ে আছে। হ্যাঁ, বিলেতই যাচ্ছে ও। পাসপোর্ট ভিসা সবই প্রস্তুত। রঙিন স্বপ্ন দেখেই সেদিন আবেদন করেছিল। সঙ্গে অনিতা যাবে। একই সঙ্গে ট্রেনিং-লাভ ও মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপন। কাজের শেষে হু'জনে ঘুরে বেড়াবে মানস-তীর্থে।···ভাগ্য—সবই ভাগ্য। কোথায় মধুচন্দ্রিমা

উদ্‌যাপন আর কোথায় অপরাধীর মতো পালিয়ে যাওয়া। এতো নির্বাসন দণ্ডই হচ্ছে। মেঘদূতের যক্ষের তবু সময়-সীমা ছিল। কিন্তু ওর তো তাও নেই। ওযে স্বেচ্ছায় নিচ্ছে এ হৃদয়-বিদারী দণ্ড। না না, দণ্ড নয়। বেঁচে থাকার এই একমাত্র পথ। কাছে দাঁড়িয়ে ও কারও অপমান সহ্য করতে পারবে না। আত্মহত্যাও ওর পক্ষে সম্ভবপর নয়। ওর এই নির্বাসনেই অনিতা সুচরিতা বাঁচবে—ও নিজেও। সরকার অবশ্য দু'বছরের জন্য পাঠাচ্ছেন। কিন্তু ও জানে, চিরজীবনের জন্যই ও যাচ্ছে। দরকার হয় অন্য কোথাও পালাবে।··· ভাবতে ভাবতে মাথাটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে প্রশান্তর। সেই উত্তপ্ত মস্তকে আবার ভাবে, এই ভাল। অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবে ও। কে অনিতা—কে সুচরিতা ? এ নামে কাউকে ও চেনে না। ডক্টর দাশগুপ্ত, শ্রীমতী দাশগুপ্ত, দাদু কাউকে নয়। সব স্বার্থপর—সব সুখের পায়রা। ও চায় না কাউকে। কালস্রোতেই গা ভাসিয়ে দেবে। মা-মণির হয়তো খুবই কষ্ট হবে। তা আর কি করা ? ···চুপচাপ বসেছিল প্রশান্ত, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। দ্রুত পা চালিয়ে দেয় কোয়ার্টারের দিকে। ড্রয়ারে অনিতার ফটো রয়েছে—দুঃস্বপ্নের প্রহেলিকা। এক্ষুনি ও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে ও ফটো। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্ষুনি।···

সারা পথ ছুটে আসে প্রশান্ত। সিঁড়ি দিয়েও হন্তদন্ত হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু উঠে এসে যে দৃশ্য নজরে পড়ে তাতে আর কোন উৎসাহ থাকে না। অনিতা আর সুচরিতা দু'জনে ওর ঘরে পাশাপাশি বসে স্বচ্ছন্দ গল্প করছে। দু'জনের চোখে মুখেই অপূর্ব প্রসন্নতার ছাপ। কারো মুখে এতটুকু ঘৃণা কিংবা লজ্জার অভিব্যক্তি নেই। সুন্দর দুটি সহজ সরল মমতাময়ী নারীর প্রতিমূর্তি। একটি গোলাপ আর একটি চন্দ্রমল্লিকা। ওর যে কোন একটি হলেই চলে। চেয়েছিলও ও একটিকেই। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা—মোহচ্ছটায় সব গোলমাল করে দিলে। এখন তো সারা জীবন শুধু দগ্ধে মরতে

হবে।···ঘাতকের মীমাংসা নিয়ে ছুটে এসেছিল প্রশান্ত, শান্তির প্রতিমূর্তি দেখে মুষড়ে পড়ে। লজ্জায় ক্ষোভে অভিভূত হয়ে যায়। কাউকে কোন সম্ভাষণ জানাতে পারে না।

অনিতা আজ প্রায়শ্চিত্ত করতেই এসেছে, ও তাই দমে না। হালকা সুরেই আরম্ভ করে : মহাশয়ের এত দেরি হলো? শকুন্তলা যে পথ চেয়ে চেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন—

প্রশান্ত দপ করে আবার জ্বলে উঠতেই যাচ্ছিল। কিন্তু পারে না। হাসির কথায় না হেসে গম্ভীরভাবেই উত্তর দেয়, অফিসে কাজ ছিল।

সুচরিতা না বুঝলেও অনিতা এ গাম্ভীর্যের মানে বোঝে। তবু না বোঝার ভান করেই আবার বলে, তা'হলে তো খুবই পরিশ্রান্ত। কই গো লাজুকলতা, মহারাজকে ব্যজনী করো, উনি যে রাজকার্যে ক্লান্ত, হেসে সুচরিতার চোখে চোখ রাখে অনিতা।

অনিতার রসিকতায় সুচরিতা লজ্জাবতী লতার মতো মুখ নিচু করে শুধু হাসতে থাকে। কোন উত্তরই দিতে পারে না। প্রশান্তও না। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে ওর।

অনিতা আর ঘাঁটাতে সাহস করে না। সোজাসুজি বলে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? যান, চট করে হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। চা প্রস্তুত।

প্রশান্ত তাই যায়। যেতে যেতে ভাবে, সুচরিতা কি তাহলে কিছুই জানে না। অনিতার পক্ষেই বা এতটা অভিনয় কি করে সম্ভব। একদিন তো সবই জানাজানি হয়ে যাবে। ডক্টর দাশগুপ্তকে এ মুখ দেখাবো কি করে? না, লণ্ডনে নির্বাসন নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।···ভাবতে ভাবতেই চায়ের টেবিলে এসে বসে প্রশান্ত। আয়োজনের আতিশয্যে বিস্মিত হয়। সত্যি, অনিতাকে বোঝা ভার।···

প্রশান্ত যাই ভাবুক, অনিতা সত্যি আজ হৃদয়ের খেলায় মেতেছে। চা পর্বের পর স্বেচ্ছায় ও পর পর দু'খানা গান গেয়ে যায়। প্রশান্তর সুর ও কথা; কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার গান। ফুল থেকে···

নিজের গান শেষ করে সুচরিতাকে গাইতে অনুরোধ করে অনিতা। কিন্তু সুচরিতা কিছুতেই রাজী হয় না। এক—লজ্জা, দুই—অনেক দিন রেওয়াজ নেই। অনিতার পর ওর সাহসই নেই গাবার।

কিন্তু প্রশান্ত কিছুতেই রেহাই পায় না। বেহালায় ছড়ি ওকে টানতেই হয়। ঘোরতর আপত্তি নিয়েই আরম্ভ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের সুরচ্ছন্দে নিজেই তন্ময় হয়ে যায়। বিরহী আত্মা যেন গলে গলে পড়ছে বেহালার ঝংকারে।

সুচরিতা অনিতা বিস্ময়-বিমূঢ়। অনিতার বোধ হয় হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়ে যায়। বাজনা থামলে ও কলঘরে ছুটে পালায়। নির্জনেই অশ্রু বিসর্জন করে।

রাত আটটার কাছাকাছি দু'জনে উঠে পড়ে। প্রশান্ত কোন রকমে সদর পর্যন্ত আসে।

এক্কায় উঠে কারো মুখে কোন কথা নেই। সুচরিতাকে রীতিমতো বিমর্ষ দেখায়। হাসতেই এসেছিল ও, কাঁদতে নয়। কিন্তু প্রশান্তর বেহালায় তবু যে কান্নার সুর। আবার ভাবে, কান্নার সুর বাজবে বই কি। কতদিন একা একা বিরহ যাতনা ভোগ করছেন। দাদু তো বলছেন, সামনের অঘ্রানেই···হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হোক। বাবা বিশ্বনাথ যদি শরীরটা ভাল রাখেন আমার।···মনে মনে বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে সুচরিতা। বিমর্ষ মুখ মুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে ওঠে। কাল আবার আসবে। অনিতা যদি দেরি করে ও একাই আসবে। লজ্জার কি ? উনি তো আর পর নন ওর।···

এক্কা ছুটে চলেছে। সুচরিতা ভ্রমণের আনন্দই ভোগ করছে। কিন্তু অনিতা বোধ হয় দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। ওর বুকের ভেতরে বিরহী আত্মা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। অনিতা যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তাই হয়। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুতেই প্রশান্তর সঙ্গে দেখা। উত্তেজনায় গতকাল সারা রাত বিনিদ্র কেটেছে প্রশান্তর। এ ক'দিনে ও যতটা ভুলে গিয়েছিল গতকাল অনিতা সুচরিতার আবির্ভাবে আবার তা দশগুণ হয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু করেছে। সারা রাত যাতনার মধ্যে কেটেছে। কিন্তু জীবনটা তো আর ছেলে-খেলা নয়। অনিতাকেও সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করবে, কি চায় অনিতা।

প্রশান্ত বিকেল চারটে না বাজতেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। অনেক ভেবে-চিন্তে একাকীই ইউনিভার্সিটির মোড়ে অপেক্ষায় থাকে অনিতার জন্য। ওর ছুটি হলে ধরবে ওকে। নিরিবিলিতে দু'জনে কোথাও গিয়ে বসবে। পরস্পর জানবে পরস্পরের মনের কথা। কোয়ার্টারে সে সুযোগ নেই। কখন কে আসে বলা যায় না। কি অঘটনই না ঘটে গেল সেদিন। অদৃষ্ট—সবই অদৃষ্ট।···একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে প্রশান্ত।

বিকেল পাঁচটায় ছুটি হয়ে যায় অনিতার। ওর চরম দুর্ভাগ্য, আজ ও একা। হ্যাঁ দুর্ভাগ্য বই কি। প্রশান্তর একক সঙ্গলাভ আজ আর ওর কাম্য নয়। লিলির ক্লাস তিনটেয় ছুটি হয়ে গেছে। ও হয়তো এতক্ষণে বাসায় ফিরে আরাম করছে। লিলি ছাড়া আর তো কোন সঙ্গী নেই ওর। প্রশান্ত হয়তো সব খোঁজ-খবর নিয়েই এসেছে। কিন্তু কেন? ওকি জানে না, হৃদয়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে ওর। নারীর জীবনে এর চেয়ে চরম আঘাত আর কি হতে পারে? কিন্তু তবু কি চায় প্রশান্ত?···

চোখোচোখি হতেই মুখ নত করে নেয় অনিতা। যেন একমুঠো লঙ্কার ঝাল কেউ ওর দু'চোখে ছিটিয়ে দিলে। পেছন ফিরে

তাড়াতাড়ি আবার ইউনিভার্সিটির দিকেই ছুটতে যায়। ভাবখানা, একটা যেন কিছু ফেলে এসেছে। একটু দূরে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। ব্যথায় টন্‌টনিয়ে ওঠে বুকের ভেতরটা। মানুষ এমন করেও মানুষকে আঘাত দিতে পারে!... কিন্তু প্রশান্ত তো যাবার নয়। ঐ তো দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে-মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। ওকে ভদ্রভাবেই নিরস্ত করতে হবে। আর সুচরিতার মুখ চেয়েই তা করতে হবে। বেচারা, দীর্ঘকাল অসুখে ভুগছে। কে জানে, ও-ও কোন আঘাত পেয়েছে কি না। দেখে তো মনে হয়, মনের অসুখেই ভুগছে। মাত্র দিন কয়েক একটু চাঙ্গা দেখাচ্ছে ওকে। হয়তো রঙীন স্বপ্নই দেখছে আবার। এবার আঘাত পেলে আর সহ্য করতে পারবে না। না না, আঘাত ওকে পেতে হবে না। প্রশান্ত একান্তভাবেই ওর—ওরই থাকবে। মাঝখানে দিন কয়েকের এই বিভ্রান্তি। এতো নিছক অভিনয়। অভিনয় আর কবে সত্যি হয়েছে? লোকে রাজা সাজে—রানী হয়—চোর হয় কত কি। অভিনয় শেষে সব শেষ। প্রশান্ত ওর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছে। এতে আর দোষ কি? আর এতে বিচলিত হবারই বা কি আছে! ভেঙে পড়েছিল অনিতা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। উদ্যমের সঙ্গে এসেই প্রশান্তর মুখোমুখি দাঁড়ায়। অভিনেত্রীর ঢঙেই প্রশ্ন করে, আরে আপনি! কতক্ষণ?

অনিতা হালকা হলেও প্রশান্ত হালকা হতে পারে না। গম্ভীর থেকেই উত্তর করে, হ্যাঁ আমি। কিন্তু অসময়ে নিশ্চয় নয়?—প্রশান্তর সুরে খানিকটা ক্ষোভই প্রকাশ পায়।

অনিতা বিচলিত হয় না। স্বকীয়তা রেখেই উত্তর দেয়, তা একটু অসময়ে বই কি। আমাকে যে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। জরুরী কাজ রয়েছে।...

তোমার সঙ্গে আমার কাজ তার চেয়েও জরুরী, মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর করে প্রশান্ত।

হেসে অনিতা বলে, বেশ তো, বাসায় চলুন না। আপনার কাজও হবে আমার কাজও হবে।

বাসায় বসে যে একাজ হবে না তা তুমি নিশ্চয় জানো।

প্রশান্তর জবাবের ভঙ্গীতে অনিতার বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে থাকে। এতদিনের ভেতরে ওর এ রকম মূর্তি আর কখনো দেখে নি ও। তবু সাহসে ভর করেই উত্তর দেয়, তা জানি বই কি। এতদিন দেখছি এটুকু আর জানাবো না?

ঠাট্টা নয় অনু। সত্যি তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। প্রশান্তর গলা সহসা কেন যেন খাদে নেমে আসে।

অনিতা এতক্ষণ অবিচলিত ছিল। প্রশান্ত যত গর্জে উঠছিল ওর ততই সুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু ওর ভাবান্তরে ওরও হৃদয়-বীণায় ঘা লাগে। এই প্রশান্ত, যাকে দিনে একবার না দেখতে পেলে মন ওর ভারী হয়ে উঠতো, সে আজ এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তবু মুখ ফুটে কোন সম্ভাষণ জানাতে পারছে না। নিরালায় ডেকে নিয়ে গিয়ে পাশে বসতে পারছে না। অনিতা হয়তো বা কেঁদেই ফেলে। কিন্তু না, ভেঙে পড়লে তো ওর চলবে না। সুচরিতার ভবিষ্যৎ যে ওরই হাতে। নিজে যে আগুনে জ্বলছে সে আগুনে অপরকে কি করে জ্বালাবে? সুচরিতা তো ওর আপনজন—ছোটবেলার বান্ধবী।...অনিতা অবিচল থেকেই উত্তর করে, বেশ চলুন, তবে বেশীক্ষণ কিন্তু বসতে পারবো না।

প্রশান্ত মুখে আর কোন জবাব দেয় না। ধীরে ধীরে পা চালাতে থাকে মাঠের দিকে। ইউনিভার্সিটির শেষ ক্লাস করে বেরিয়েছে অনিতা। সুতরাং ভিড় বিশেষ নেই। দেখতে দেখতে সমস্ত পথ ঘাট ফাঁকা হয়ে যায়। ওদের মতোই দু'চারজন ভ্রমণকারীকেই শুধু দেখা যায়। কেউ কেউ ওদের মতো যুগলেও এসেছে।

সূর্য অস্ত যায় যায় ওরা নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসে। জীবনের অনেক সন্ধ্যাই ওরা এখানে কাটিয়েছে। চারদিকের প্রতিটি গাছ

আকাশের অনন্ত কোটি নক্ষত্র তার সাক্ষী। জীবনের প্রথম স্বপ্ন ওরা এখানে বসেই দেখেছিল। এখানে বসেই পরস্পর পরস্পরকে হৃদয় দিয়েছিল। আজ আবার এখানে বসেই তার হিসেব-নিকেশ হচ্ছে। না না, হিসেবের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। জমার খাতায় প্রশান্তর আর কোন চিহ্ন নেই। স্বপ্ন-সাধ ভেঙে গেছে ওর। এখন শুধু অভিনয়। হয়তো শেষ অভিনয়।...অনিতার বুকের ভেতরে বসে কে যেন পাথর ভাঙতে থাকে। ও যেন আর ওর মধ্যে নেই।

প্রশান্তকেও বড় বিমর্ষ দেখায়। শুরু ওকেই করতে হবে। কিন্তু কি দিয়ে হবে তার সূচনা তা ও ভাবতে পারছে না। সকরুণ দুটি চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

অনিতা যেন দেখেও দেখে না। মুখ নিচু করেই বসে থাকে।

প্রশান্ত শুরু করে, কথা বলছো না যে অনু?

শ্বাসরোধের পর যেন এক লহমায় প্রাণবায়ু ফিরে পায় অনিতা। ফিক করে হেসে ফেলে। হেসে হেসেই বলে, বারে, আপনিই তো জরুরী কথা শোনাবার জন্যে নিয়ে এলেন?

শুষ্ক গলায় প্রশান্ত বলে, তোমার কোন কথা নেই?

অনিতা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারে না। মাথা নত করে নেয়।

খানিকটা দূরত্ব রেখেই বসেছিল অনিতা। ওর নিরুত্তরে প্রশান্ত সে দূরত্ব-সীমা পূরণ করে উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠে শুধোয়, তোমার কি হয়েছে অনু?

অনিতা জ্বলে উঠে সরাসরিই উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারে না। হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ অবরুদ্ধ রেখেই উত্তর দেয়, কি আবার হবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রশান্ত বলে, তোমার কিছুই হয় নি, না?

অভিনয়ের মাত্রা চড়িয়ে অনিতা বলে, বলছি তো কিছু হয় নি। কাজের কথা না বলে শুধু শুধু বাজে কথা!

প্রশান্ত এবার আর ধৈর্য রাখতে পারে না। কর্কশ স্বরেই জবাব

দেয়, কাজের কথাই শোন তাহলে। তুমি কি আমাকে ভুলে গেলে অনিতা?

আপনাকে ভুলবো! সে কি কথা! আপনি হলেন স্বয়ং শ্রীপ্রশান্তকুমার সেন ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অব পোস্ট অফিসেস।

হেঁয়ালি আমি পছন্দ করি না অনু। তোমার স্পষ্ট জবাব চাই, প্রশান্ত গর্জে ওঠে।

কিন্তু অনিতা আজ সত্যি অভিনয়ে মেতেছে। তর্জন-গর্জন না করে রসিয়ে রসিয়েই বলে, স্পষ্ট করেই তো বলছি, তবু আপনি চটছেন। রাত্রে হয়তো আপনার ভাল ঘুম হয় নি। ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার লক্ষণ। সুসম খাদ্য এবং নিয়মিত ব্যায়াম আবশ্যক, অনিতার ওষ্ঠে হালকা হাসির চমক।

প্রশান্ত ওর ন্যাকামো বরদাস্ত করতে পারে না। ওর ইচ্ছে হয়, ঠাস করে অনিতার বাঁ গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু পারে না। রাগের বদলে কারুণ্যই ঝরে পড়ে ওর ক্ষীণ কণ্ঠে। বিনিয়ে বিনিয়েই বলতে থাকে, অনু, তোমার কাছে আমি কোন কথাই লুকাবো না। স্বাভাবিকভাবেই হয়তো সুচরিতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যেতো। কিন্তু আজ আর তা সম্ভব নয়। তোমাকে আমি ভালবাসি···

অনিতা আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে ওর। কিন্তু কান্নার বদলে হাসিই ফুটে ওঠে ওর পাপড়ি ঠোঁটে। হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার বিলক্ষণ অসুখ করেছে। ডাক্তার দেখানো দরকার। দাদুকে বলে কালই আমি সে ব্যবস্থা করবো।···বলতে বলতে ঝাঁ করে উঠে পড়ে অনিতা। একটা এক্কা ডেকে ছুটে পালায়।

প্রশান্ত হতবাক্‌। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে ওর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে।

একান্ত নাটকীয় ভাবেই মঞ্চ ত্যাগ করে অনিতা। কিন্তু একায় উঠে ভেঙে পড়ে। প্রশান্তর দিকে ফিরে তাকাতেও ভরসা পায় না। ও তো নিশ্চয় ওর পথের দিকে চেয়ে আছে। হয়তো অশ্রুই ঝরছে ওর দু'চোখ দিয়ে। বেচারা, সহজ কথা সহজ করেই শোনাতে চেয়েছিল। কিন্তু সুযোগ পেলে না। ভালবাসায় মানুষ তো সত্যি অন্ধ। কোন যুক্তি দিয়ে তার গতি রোধ করা যায় না। অনুশাসন দিয়েও নয়। মন বুঝ মানলেই ভাল নয়তো কোন পথ নেই। নিজেও কি ও বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারতো? প্রশান্ত সমুদ্র। ক্ষীণ তরঙ্গিণীর মতোই উদ্দাম গতিতে ওর পানে ছুটে চলেছিলাম। সুচরিতা না হয়ে অন্য কেউ হলে হয়তো কোন বাধাই বাধা হতো না। সুচরিতাই বা কেন? প্রশান্ত তো বলে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারেই ও সারা জীবন কাটিয়ে দেবে। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব কারো নাগালের মাধ্য থাকবে না। কিন্তু মন তো তবু সায় দেয় না। পালিয়ে হয়তো আত্মরক্ষা করা যায়। কিন্তু আত্মজয় সম্ভব নয়। চিতার আগুন দ্বিগুণ হয়েই জ্বলবে। সে আগুনে প্রশান্ত জ্বলবে সুচরিতা জ্বলবে আমি জ্বলবো—আত্মীয়-স্বজন সব। কাকামণির উন্নত শির নত হবে। না না, তা কিছুতেই হতে পারে না। আত্ম সুখের চেয়েও সকলের সুখ বড়।···অনিতা জগদ্দল পাথরের মতোই একায় বসে থাকে। দৃষ্টি ওর সম্মুখে—পশ্চাতে নয়। এ যেন শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন দ্বারকায়। শত সহস্র গোপিনী পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। রথের তলায় আত্মাহুতিও দিচ্ছেন অনেকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রথ তবু থামছে না। একটানা ছুটে চলেছে কর্ত্তব্যের পথে।···হ্যাঁ হ্যাঁ, কর্ত্তব্যই তো মানুষকে মানুষ করে। ভালবাসার চেয়েও কর্ত্তব্য বড়।···ভেঙে-পড়া মনে অনিতা কিছুটা বল পায়।

শোবার ঘরে অনিতা আজ একা। লিলি ওর এক বান্ধবীর বিয়েতে গিয়েছে। আজ রাত্রে আর ফিরছে না। বিছানায় শুয়ে অনিতা ছটফট করতে থাকে। ছ'চোখে যেন ঘুমের লেশমাত্র নেই। সারা রাত আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। চোখের জলের সঙ্গে যেন গলে গলে পড়ছে হৃদয়ের মর্মবেদনা। অভিনয় যত নিখুঁতই হোক না কেন প্রশান্তকে ভুলে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রাণের আধখানাই যে প্রশান্ত। চোখ বুজলেই যে ভেসে ওঠে ওর সুডোল মুখখানা। কত করেই না স্বপ্ন দেখেছিল বেচারা। ঘর বাঁধার স্বপ্ন। প্রজাপতির পাখায় ভর করে উড়ে চলার স্বপ্ন। কিন্তু সবকিছু আজ খান খান হয়ে ভেঙে গেল। এখন তো বাকী জীবন শুধু কেঁদে কাটাতে হবে—শুধু আত্মবঞ্চনা।

নিশীথ রাত্রি। নির্জনতায় কাশীর পথ-ঘাট থমথম করছে। রাস্তার আলোগুলো বোধ হয় জ্বালতেই ভুলে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা। নিরন্ধ্র অন্ধকার। এমন ঘনিভূত অন্ধকারের মুখোমুখি অনিতা জীবনে হয় নি। আকাশ জুড়ে ঝড়ের সঙ্কেত। ঘন কৃষ্ণ মেঘের সমারোহ। ঘর থেকে বেরিয়ে রেলিংএ এসে দাঁড়ায় অনিতা। একমনে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দমকা হাওয়ায় সিঁড়ির দরজায় ঘা লাগে। চমকে ওঠে ও। ওকি! প্রশান্ত এত রাত্রে কোত্থেকে এল! ওরও কি সারারাত ঘুম হয় নি? প্রশান্ত—প্রশান্ত ছুটে গিয়ে রেলিংএর একটা থামকে জড়িয়ে ধরে। চেতন মন অচেতন পদার্থের স্পর্শে আবার সচেতন হয়ে ওঠে। কই কেউ তো নেই! প্রশান্ত আসবে কেন? নিজের হাতে যে আজ ওকে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। প্রশান্ত তো আর ওর নয়। ওকি একদিনে পাগল হয়ে গেল! কোথায় অন্ধকার? ঐ তো রাস্তার আলোগুলো রোশনাই ছড়াচ্ছে। তারায় তারায় ঝলমল করছে অনন্ত আকাশ। শুভ্র চাঁদ উঠেছে। অন্ধকার কই। আলো—আলো—চারিদিক জুড়ে জ্বলছে

জ্ঞানের আলো—সত্যের আলো। সেই সত্যের পথই ওর পথ। সুচরিতা প্রশান্তর চার হাত এক করে দিতে হবে। ওদের মিলনেই হবে ওর মোহমুক্তি—অভিনয়ের শেষ।···কান্নায় কান্নায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছিল অনিতার আবার স্বচ্ছতা ফিরে আসে। বুকখানাও হালকা বোধ হয়। কর্তব্যের ডাকে ওকে অবিচল থাকতেই হবে।···

রেলিং থেকে ঘরে ফিরে আসে অনিতা। ঘর থেকে বিছানায়। আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। হয়তো বা ঘুমিয়েই পড়ে।

প্রশান্তরও সে রাত্রে ঘুম হয় না। তবে অনিতার মতো মায়া কান্না কাঁদে না ও। নিজেকে বড় অপমানিত মনে হয়েছে ওর। জীবনে অনেক আশা ব্যর্থ হয়েছে। অনেক স্বপ্ন টুটে গেছে। কিন্তু এমনটি আর কখনো হয় নি। স্বাভাবিক নিয়মেই একটি নারীকে জীবন সঙ্গিনী করতে চেয়েছিল ও। তাকে প্রাণভরে ভালবাসার সঙ্কল্পই ছিল। কিন্তু সে নারী আজ ওর কাছে ছলনাময়ী ছাড়া আর কিছু নয়। সংসারে আজ আর ওর কি রইলো? মানুষের কাছে পেলোই বা কতটুকু? কাজ নেই ঘর-সংসারে। বিলেতই ওর ভালো। ওখানেই সকল জ্বালা থেকে ভুলে থাকা যাবে।···রাত ভোর চিন্তা করে প্রশান্ত ঠিক করে মাঝখানের দুটো মাস ছুটিতে কাটাবে। চেনাশুনোর বাইরে।···

পরের দিন। কর্তব্যের পথেই এগিয়ে যায় অনিতা। আজ আর ওর ক্লাস নেই, ছুটি। ঘরেও আজ ও একা। লিলি ক্লাসে গেছে। দুপুরের আহারের পর খানিকটা ঘুমোতেই চেষ্টা করে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারে না। মাথার পোকাগুলো কিলবিলিয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করে, কাল প্রশান্তকে ফাঁকি দিয়েছে। আজ স্বেচ্ছায় আবার ধরা দেবে। শুধু ধরাই নয় জীবনের দেনা পাওনা চুকিয়ে ফেলবে। জমার ঘরে প্রশান্তর খাতায় সুচরিতা

একা থাক। খরচের ঘরে ও—ওর জীবনের সমস্ত সত্তা। আজকের অভিনয়ই হবে শেষ অভিনয়।

বিকেল তিনটে না বাজতেই বেরিয়ে পড়ে অনিতা। সোজা প্রশান্তর কোয়ার্টারে না গিয়ে বাঙালী টোলার ফটোর দোকান হয়ে যায়। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি গিয়ে লাভও নেই। প্রশান্ত তো এখন নিশ্চয় অফিসে। তবে ছুটি হবার খানিকটা আগে গিয়েই পৌঁছুতে হবে। হিসেব মতো চা জলখাবার সব তৈরি থাকা চাই। ও যেন ভাবতে পারে কিছুই হয় নি। জগৎ যেভাবে চলছিল ঠিক সেভাবেই চলছে।...

সুচরিতার ফটোটি বেশ মনের মতোই হয়েছে। প্রশান্তর কেমন লাগবে সে প্রশান্তই জানে। কিন্তু ওর নিজের খুব পছন্দ হয়েছে। যে কোন মানুষ মুগ্ধ হবে সুচরিতার এ ফটোগ্রাফ দেখে। পাঁচ টাকায় চমৎকার তিনখানি ফটো। অনিতা সব ক'খানা নিয়েই প্রশান্তর কোয়ার্টারের দিকে রওনা হয়। একবার ভাবে, দু'খানা সুচরিতাকে দিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উৎসাহ থাকে না। সুচরিতা যদি সঙ্গ নেয়? আজ তো একক অভিনয়ের পালা। একা না গেলে প্রশান্ত মুখ খুলতে পারবে না। প্রশান্তকেও মুখ খুলে কিছু বলা যাবে না।...অনিতা একাই এক্কায় উঠে পড়ে। প্রায় পাঁচটার কাছাকাছি কোয়ার্টারে এসে পৌঁছোয়। দোরে ঘা পড়তেই ভজহরি আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ওঠে। আজ ক'দিন ওর দাদাবাবু প্রায় কিছুই খাচ্ছেন না। বলতে গেলে কথাও প্রায় বন্ধ। সব কিছুতেই অন্যমনস্ক।...

অনিতা ওকে আশ্বাস দিলেও নিজে মুষড়ে পড়ে। ছি ছি ছি, ওরই ভুলের জন্য বেচারার এ শাস্তি।...পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় গিয়ে ওঠে অনিতা। প্রশান্তর ঘরের দরজার সামনে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দরজা জানালা সবই উন্মুক্ত। শুধু একটা পর্দার ব্যবধান। কিন্তু তা সরিয়েই অনিতার প্রবেশ করতে

বাধে। কিন্তু চুপচাপ একা ঘরে বসে কি করছে প্রশান্ত? কোন সাড়া শব্দই যে নেই। ও কি কাঁদছে?…প্রবল উৎকণ্ঠায় পর্দা টেনে মাথা গলিয়ে দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে দৃশ্য নজরে পড়ে তাতে আর পুরোপুরি প্রবেশ করার উৎসাহ থাকে না। নীরবেই প্রহর গুণতে থাকে।

প্রশান্তর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর দিকে পেছন ফিরে স্থির দৃষ্টিতে একটা ডেক-চেয়ারে বসে আছে। হাতে ফটোর এ্যালবামটা খোলা। ও এ্যালবাম ওর সুপরিচিত। নানা উপলক্ষে নানা ভঙ্গী-মায় তোলা ওদের দুজনের রাশিকৃত ফটোগ্রাফ। খোলা পাতার প্রতিবিম্ব সামনের আয়নায় জ্বলজ্বল করছে। ও ফটো ওর একার—আবক্ষ পরিমিত। প্রশান্তর বিগত জন্মদিনে স্বাক্ষরযুক্ত করে উপহার দিয়েছে ও। দেখে দেখে দম আটকে আসে অনিতার। শাড়ীর আঁচলে চোখ মোছে।

এ্যালবাম থেকে খুলে ওর দেওয়া ফটোটা নিয়ে দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে প্রশান্ত। হয়তো অতীতের মধুর স্বপ্নেই আত্মহারা। চুম্বকই যেন লৌহকে আকর্ষণ করছে। আবেগে বুকের মধ্যে চেপে ধরতে যায়।

অনিতা আর স্থির থাকতে পারে না। এক লহমায় ছুটে গিয়ে বাজপক্ষীর মতো ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয় ফটোটা প্রশান্তর হাত থেকে। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

ক্রোধে প্রশান্ত গর্জে ওঠে। ঠাস করে একটা চড়ই বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল ওর বাঁ গালে। কিন্তু পারে না। রুদ্ধ আবেগে থর থর করে কাঁপতে থাকে। ঢোক গিলে একান্ত করুণভাবেই বলে, এ তুমি কি করলে অনু?

জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল অনিতা। কোন উত্তর দেয় না। মুখ ঘুরিয়ে থাকে।

প্রশান্ত আবার বলে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে অনু?

অনিতা ততক্ষণে নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে। ঠোঁটে হাসি টেনে ঘুরে দাঁড়ায়। হালকা সুরেই উত্তর দেয়, ক্ষেপে আমি যাই নি মশায়, আপনি গেছেন। বলতে বলতে সুচরিতার ফটোখানা বার করে টেবিলের ওপর রাখে। শুধু সুচরিতার একার ফটোই নয়। টেবিল-ফ্রেমে আঁটা প্রশান্ত সুচরিতার যুগল ফটো।

প্রশান্ত হাসবে কি কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না। অনিতাকে বুঝে ওঠাও শক্ত হয়ে ওঠে। করছে কি ও। নিজের বাঞ্ছিত স্থানে স্বেচ্ছায় ও অপরকে বসাচ্ছে। না, তা হতে পারে না।...গম্ভীর ভাবেই বাধা দেয়, ও ফটো তুমি ওখানে রাখবে না।

কোথায় রাখবো—বুকের মাঝে? আপনার ধন আপনি যেখানে খুশি রাখুন। আমি চললুম, বলতে বলতে বাইরের দিকে পা বাড়ায় অনিতা।

প্রশান্ত বাধা দেয়, দাঁড়াও।

অনিতা হাসতে হাসতেই ঘুরে দাঁড়ায়। চাপল্য নিয়েই বলে, মৃন্ময়ীকে দেখে যদি চোখ না জুড়োয় চিন্ময়ীকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হেঁয়ালি আমি পছন্দ করি না অনু। যা জিজ্ঞেস করছি স্পষ্ট জবাব দাও।

বেশ বলুন জাহাঁপনা।

তুমি কি আমাকে ভুলে গেলে?

আবার পাগলামো শুরু হলো তো।

পাগলামো আমি করছি, না তুমি?

হায় আমার কপাল! সাহিত্যিক হয়ে দেখছি আপনার এতটুকু রসবোধ নেই!

তার মানে?

মানে সুচরিতা আমার বোন। আপনি তার পতিদেবতা। ভগ্নিপতির সঙ্গে কি মানুষ এটুকু মজাও করবে না?

মনকে চোখ ঠেরো না অনু। আমারই না হয় রসবোধ নেই— হাসিঠাট্টা বুঝি না। কিন্তু মাস্টারমশায়, তিনিও কি ভুল বুঝেছেন? আমাদের বিয়ের প্রস্তাব তিনি করেন নি?

তাই করেছেন বুঝি? প্রবাদ আছে, জানেন তো, দীর্ঘদিন মাস্টারী করলে মানুষ আর মানুষ থাকে না।

লেখাপড়া শিখে মাস্টারমশায়দের ওপর তোমার খুব ভক্তি শ্রদ্ধা হয়েছে তো!

যা হয় নি তা কি চোখ রাঙিয়ে হবে?

দোহাই অনু, তামাসা রাখো। আমি বুঝতে পারছি, তুমি নিরূপায় হয়েই পাশ কাটাতে চাচ্ছ। চলো আমরা পালিয়ে যাই। উচ্ছ্বাসে অনিতার দু'হাত চেপে ধরে প্রশান্ত।

অনিতা ঝংকার দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয়। গর্জে ওঠে, ছি, আপনার সঙ্গে!

কেন, আমি কি তোমার অযোগ্য?—প্রশান্তর গলার স্বর কর্কশ শোনায়।

অনিতা তার চেয়েও এক ডিগ্রী চড়িয়ে বাধা দেয়, সামান্য একজন কেরানীর স্পর্ধা তো কম নয়! বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ—তীব্র বেগের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অনিতা। সমস্ত ঘরখানা যেন অট্টহাসিতে বীভৎস হয়ে ওঠে।

প্রশান্তর উন্নত শির সহসা কে যেন জোর করে পা দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। অপমানে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারলেই যেন ও বাঁচে। এক নিমেষে জীবনের সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। সমস্ত বিশ্বজগৎটা যেন চোখের সামনে পাঁইপাঁই করে ঘুরছে। টেবিলে মাথা গুঁজে ধপ্ করে বসে পড়ে প্রশান্ত।

রাস্তায় বেরিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে অনিতার। ওর মনে হয়, এইমাত্র খুন করে এল ও প্রশান্তকে। সজ্ঞানে স্বহস্তে।

না না, খুন ও প্রশান্তকে করে নি। খুন করেছে নিজেকে নিজে। এইমাত্র ওর জীব-আত্মাকে প্রশান্তর কোয়ার্টারের উপরে রেখে এল। আশা-আকাঙ্ক্ষা সব। এখন তো সারা জীবন শুধু কেঁদে কাটাতে হবে। কিন্তু বিলাপ করবার সময় তো এখন নয়। এখনও যে অভিনয়ের অনেকটা বাকী। সুচরিতা প্রশান্তর মিলন হয় নি। যত মর্মভেদীই হোক এ কাজ ওকে শেষ করতেই হবে। পাষাণে বুক বাঁধে অনিতা। তাড়াতাড়ি এক্কা ডেকে উঠে পড়ে। লক্ষ্য বাঙালী টোলা—সুচরিতার কাছে। আচ্ছা মেয়ে বটে সুচরিতা। আস্ত একটা মাটির পুতুলই যেন। নিজের স্বামীর সঙ্গে মেলামেশা করবে তাতেও ওর লজ্জা। অথচ লেখাপড়া না জানে তাও নয়। ছোটবেলায় দু'জনের নাকি গলায় গলায় ভাবও ছিল।...গাড়িতে উঠে ইতস্তত ভাবতে থাকে অনিতা। ভাবতে ভাবতে এক একবার মনে হয়, সুচি কি তাহলে সব জেনেছে? প্রশান্ত নিজেই সব ফাঁস করে দেয় নি তো? যে রকম ক্ষেপে গেছে তাতে ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

দেখতে দেখতে এক্কা সুচরিতাদের সদরে এসে লাগে। অনিতা তৎপরতার সঙ্গেই নেমে পড়ে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সরাসরি দোতলাতেই উঠতে যায়। দাদু আগের দিনের মতো নীচের ঘরে আছেন কি নেই লক্ষ্যও করে না। আজ ওর সুচরিতাকেই চাই—দাদুকে নয়। কিন্তু দাদুর দৃষ্টি এড়ায় না। দাবার ছকে মাত হয়ে হুঁকো টানছিলেন। চোখ তুলতেই অনিতার ওপর নজর পড়ে। ওকে একা দেখে বিস্ময়ের সঙ্গেই শুধোন, তুমি একা বড়দি?

অনিতা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়ায়। শান্তভাবেই উত্তর করে, লিলির আজ অন্য জায়গায় কাজ আছে।

লিলির না হয় কাজ আছে কিন্তু সুচরিতা?

কেন, সুচি উপরে নেই?

সেকি! অনেকক্ষণ হয় ও যে তোমাদের ওখানেই গেছে!

তা হবে, আমি সোজা ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছি, চললুম। ও হয়তো একা একা বসে আছে। —অনিতা তাড়াতাড়ি পালাতে চেষ্টা করে।

দাদু এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে রসিকতা জোড়েন, একা আর ওকে বেশীদিন থাকতে হচ্ছে না। কিন্তু তুই পালাচ্ছিস কেন? আমরা কি মানুষ নই?

অনিতার জিভ শুকিয়ে গেছে। হাসি তামাসা তো দূরের কথা সামান্য উত্তর দিতেও ওর অনিচ্ছা। তবু দাদুর কথার উত্তর কিঞ্চিৎ হাসি টেনেই দেয়, মানুষ, তবে—

মনের মানুষ নই, কেমন?—অসমাপ্ত কথা মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে সমাপ্ত করেন দাদু।

অনিতা হালকা থেকেই উল্টো প্রশ্ন করে, এখনো সে সাধ যায় নাকি?

তা আবার যায় না, রঙ্গরসে গদ্‌গদ হয়ে ওঠেন দাদু।

বেশ, কাশীতে খুঁজলে অভাব হবে না। আমি চেষ্টা করবো, দাদুকে পাল্টা আর কিছু বলবার সুযোগ দেয় না অনিতা। তাড়াতাড়ি সদরের বার হয়ে আসে।

দাদু একা বসে হুঁকো টানেন আর মনের খুশীতে ভাবেন, অনিতার জন্যও পাত্রের সন্ধান করতে হবে। বড় লক্ষ্মী মেয়ে—ধীর, স্থির।

বাঙালীটোলা থেকে লক্সা—আবার একটা এক্কা করেই দৌড়ে আসে অনিতা। কিন্তু কই, সুচি তো আসে নি এখানে। লিলি তো সেই থেকে বাসায় আছে! কোন দুর্জনের পাল্লায় পড়ে নি তো! সুন্দরী মেয়ে, কাশীর পথে-ঘাটে বিপদ আছে। কিন্তু কাকেও কিছু বলে না। হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পরেই আবার বেরিয়ে পড়ে। লিলি হয়তো এক কথাতেই রাজী হয়ে যেত। বিশেষ কোন কাজ না থাকলে অন্যদিন দু'জনে এক সঙ্গেই বেরোয়। কিন্তু আজ ওকে কিছু

বললেই না। এমন কি ভাল করে কথা পর্যন্ত না। একাই সুচরিতার খোঁজে বেরোয় অনিতা। আর ও পারছে না। প্রশান্ত যে রকম জেদী—এরই মধ্যে কোথাও চলে না গেলে হয়। আঘাত বড় একটা কম পায় নি বেচারা। আত্মঘাতীও হতে পারে। এখন সুচরিতাই যদি পারে ওকে সামলাতে।

বাসা থেকে সেজেগুজে সুচরিতা অনিতাদের বাড়ির দিকেই পা বাড়ায়। কিন্তু কয়েক পা চলতেই ওর মনে হয়, লিলি অনিদি নিশ্চয় এখনো ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরে নি। তাছাড়া রোজ রোজ ওদের সঙ্গেই বা কেন ? ওরা বোন—প্রিয় বান্ধবী। কিন্তু আর একজন ? তিনি কি কেউ নন ? বিদেশ বিভুঁইয়ে একা একা আছে বেচারা। ওঁর সঙ্গে দেখা হবার পরেও কম দিন হলো না। একদিনও কি একা দেখা করা উচিত ছিল না ? উনি তো আর পর নন। ছোটবেলার খেলার সাথী। এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি। দু'জনের চলার পথও ঠিক হয়ে আছে, তবে ? হলোই বা অনিদি লিলি আপনজন তবু যে কথা নিভৃতে আমাকে বলতে পারেন সেকথা ওদের সামনে কি করে হতে পারে ? বরাবরই তো লাজুক মানুষ। এখনও সে ভাবটি কাটে নি। সেদিন তো মাথা তুলতেই পারলেন না।…অনিতাদের বাড়ির পথ ত্যাগ করে প্রশান্তর কোয়ার্টারের পথ ধরেই চলে সুচরিতা। একাই একটা এক্কায়। কিছুদূর গিয়ে আবার মনে হয়, অফিস থেকে উনিও নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি ফেরেন নি। তা না ফিরুন। ভজদা তো রয়েছে। ওর সঙ্গে বসেই না হয় খানিক গল্প করা যাবে। গল্প না করে দু'জনে মিলে কিছু খাবার তৈরিও করা যেতে পারে। অনিদি তো সেদিন তাই করল। ভজদা পুরুষমানুষ, ওর পক্ষে কি আর রান্নাবান্না সম্ভব ? লিলি অনিদি ছিল তাই। নইলে বাইরের খাবার খেয়েই স্বাস্থ্য নষ্ট করতে হতো।…

সুচরিতার আজ আর কোন লজ্জা নেই। একান্ত আপনজনের

পাশেই যাচ্ছে, ভয়েরও কিছু নেই। বহুদিন পরে আজ আবার নিবিড়ভাবে মেলামেশার সুযোগ পাবে। একায় বসে সুখের স্বপ্নই দেখে সুচরিতা। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে। সেই জামতলায় কুলতলায় দুজনে দুজনের গলা ধরে।

খানিক আগেই অনিতা প্রশান্তর সঙ্গে মর্মান্তিক অভিনয় করে চলে গেছে। প্রশান্তর হৃদয়খানা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে ও। মানুষ এমন করেও মানুষকে আঘাত দিতে পারে! প্রশান্ত একা ঘরে দাপাতে থাকে। ভজহরি ওর দাদাবাবুকে এর আগে কখনো এরকম গুরু-গম্ভীর দেখে নি। কি হলো ওঁদের? অনিতা দিদিমণি অমন করে চলেই বা গেলেন কেন? ইচ্ছে হয় প্রশান্তকে শুধোয়। কিন্তু সাহসে ভর করতে পারে না। দু'জনের জন্যেই চা জলখাবার এনে ছিল। কি করবে ভেবে পায় না। খানিক ইতস্তত করে প্রশান্তর একার মতোই টিপয়ের ওপর সাজিয়ে দিতে যায়। কিন্তু প্রশান্ত বাধা দেয়। ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই ইঙ্গিত করে। ভজহরি অগত্যা তাই যায়। এই প্রথম ও এক কথায় খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ আর অন্য দিনের মতো কোন রকমেই সাধাসাধি করতে ভরসা পায় না। মনে মনে অনিতার ওপরেই রাগ হয়! নিশ্চয় কোন কটু কথা বলেছেন। কিন্তু খেয়ে-দেয়ে সে কথা বললে কি হতো না? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? অনিতা দিদিমণি কটু কথা বলবেন দাদাবাবুকে! অমন লক্ষ্মী মেয়ে—অসুখে বিসুখে কি না করলেন!...ভজহরি খাবারের ট্রে হাতে ভাবতে ভাবতেই নীচে চলে যায়। বিকেলের হাট-বাজার এখনো বাকী। এই ফাঁকে না বেরুলে নয়।

অল্পের জন্যে অনিতার সঙ্গে সুচরিতার দেখা হয় না। অনিতা ডান হাত ঘুরে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ে। সুচরিতার একা এসে লাগে সদরে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে। ধীরে সুস্থেই ও নীচে নামে।

গাড়ির ভাড়া ব্যাগ খুলে মিটিয়ে দেয়। কিন্তু কলিং-বেল টিপতে কেন যেন সঙ্কোচ বোধ করে। কিছুতেই লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারে না। ভজদা যদি না থেকে থাকে বাড়িতে। যদি শুধু উনি একা থাকেন? কি ভাববেন? এতটা পথ একা এসেছি, পছন্দ নাও তো করতে পারেন। উনি পুরুষমানুষ, ইচ্ছে করলেই তো যখন খুশি আমাদের বাসায় যেতে পারেন। ওর যদি এটুকুতে এত লজ্জা তবে আমিই বা মেয়ে হয়ে এত উতলা হলেম কেন? না ফিরেই যাই। কেউ দেখতে পায় নি। কিন্তু এক্কাটা যে এরই মধ্যে বাঁক ঘুরল। ···সুচরিতার সব উৎসাহ মুহূর্তে উবে যায়। কলিং-বেল না টিপে হাঁটা পথেই বড় রাস্তার দিকে পা বাড়ায়। ফিরেই যাবে ও। কিন্তু ভজহরি তক্ষুনি সদর দরজা খুলে বাইরে আসে। সুচরিতাকে পেছন ফিরতে দেখে তাড়াতাড়ি সামনে এসে উচ্ছ্বাস জানায়, বারে, চলে যাচ্ছেন যে? ভেতরে চলুন, দাদাবাবু আছেন।

ফিরে যাচ্ছিল সুচরিতা ভজহরির সম্ভাষণে থতমত খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। আমতা-আমতা করেই বলতে থাকে, না—মানে—

ভজহরি মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে, ও সব মানে-টানে এখন থাক। আপনি দাদাবাবুর সঙ্গে গল্প করুন আমি বাজার থেকে এক্ষুনি আসছি। মুষড়ে পড়েছিল ভজহরি আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সুচরিতা দিদিমণি যখন এসে পড়েছেন তখন দাদাবাবু আর মুখ ভার করে থাকতে পারছেন না। এক্ষুনি সব মিটমাট হয়ে যাবে। মিলি দিদিমণি এলে তো কথাই নেই। একাই এক শ'।···ভজহরি থলে হাতে বাজারের দিকে রওনা হয়। সুচরিতা ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে।

প্রশান্তর ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায় সুচরিতা—জানালার ধারে। দরজা খোলাই রয়েছে। শুধু একটা পর্দার আবরণ। ইচ্ছে করলেই ও ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সেই ইচ্ছেই কেন যেন

ফলবতী হয় না। নিস্তব্ধ ঘর। সুচরিতা ভাবে, উনি হয়তো কোন লেখায় ব্যস্ত আছেন। বাধা পড়লে আর এগুতে পারবেন না। হয়তো চিরতরেই নষ্ট হয়ে যাবে পরিকল্পনা। সৃষ্টি অসমাপ্ত থাকবে। সুচরিতা কোন সাড়াশব্দ দেয় না। জানালার পাশেই চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। কি মুশকিলেই না পড়েছে! ভজহরি যদি ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যেত ওকে।...

অনিতার আক্রমণে প্রশান্ত ঝিমিয়ে পড়েছিল। টেবিলে মাথা গুঁজে অতীত দিনের কথাই ভাবছে। ভেবে ভেবে দু'চোখের কোণ সজল হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরে আগুন জ্বেলে গেছে অনিতা। সে আগুনে অনেকক্ষণ ধরে পরতে পরতে পুড়েছে ও। ক্রোধে লাল হয়েছে। অশ্রু ঝরেছে। কিন্তু এই অশ্রুই বোধ হয় ওকে আবার বুকে বল ফিরিয়ে দেয়। টেবিল থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে প্রশান্ত। চারদিক জুড়ে অনিতার স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। অন্তর থেকে ওকে মুছে ফেলা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। ভোলবার চেষ্টা মানেই স্মৃতির জাবর কাটা। কিন্তু ও তো স্পষ্ট জানিয়ে গেল, ওর সঙ্গে সম্বন্ধ—ও সুচরিতার দিদি। রং-তামাসাই চলেছে এ পর্যন্ত। ভুল বুঝে আমিই ওর মর্যাদাহানি করেছি।...কিন্তু তাই কি সত্য? আমার চোখেই না হয় মায়াঞ্জন ছিল। স্বপ্ন দেখেছি। খুশি মতো ভেবেছি। কিন্তু মাষ্টারমশায়? শ্রীমতী দাশগুপ্তা তো বুদ্ধিমতী মহিলা, তিনিও কি ভুল করবেন? সোজাসুজিই তো ওঁরা আমাদের বিয়ের প্রস্তাব করেছেন—অবাধ মেলামেশায় সুযোগ দিয়েছেন। সেও কি ভুল। না না, তা হতে পারে না। সুচরিতা এখানে আসার পর থেকেই ওর ভাবান্তর দেখা দিয়েছে। জীবন-সত্যকে অভিনয় বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। পাষাণী, ওতো তা সহজেই পারছে। কিন্তু এ বুকখানা যে এখনো ওর স্মৃতির দংশনে জর্জর।...মাথা তুলে বসেছিল প্রশান্ত আবার মুষড়ে পড়ে।

কিন্তু না, আর ও মায়া মরীচিকায় ভুলবে না। ছলনাময়ী, ওর সঙ্গে এ যাবৎ ছলাকলাই করে এসেছে। হ্যাঁ, সে কথা তো নিজে স্পষ্ট করে বলে গেল। ওর কণ্ঠস্বরে এতটুকু জড়তা ছিল না। হতভাগ্যের প্রেমকে ও বামন হয়ে চাঁদ ধরবার দুরাশা বলেই বিদ্রূপ করে গেল—। তবে আর এ দুর্বলতা কেন? কে অনিতা। পথের বন্ধু পথেই মিলিয়ে যাক। ও যত বড়াই-ই করুক, চাঁদ ও নয়। কিন্তু ওকে দেখিয়ে দেবো, নগণ্য এই কেরানীকে সত্যিকারের অনেক চন্দ্রমুখীই পাবার জন্য ব্যাকুল।...উত্তেজনায় আবার মাথা তুলে বসে প্রশান্ত। অনিতার রেখে যাওয়া সুচরিতার ফটোটার ওপরেই নজর পড়ে। কি সুন্দর সুষমা-মণ্ডিত মুখশ্রী। আকাশের নয়, অনিতা যদি সত্যিকারের মাটির চাঁদ দেখতে চায় তাহলে এসে দেখুক। ও যদি সুন্দরী হয় এ চাঁদ তাহলে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা—তিলোত্তমা। মোহের বসে এই তিলোত্তমারই অমর্যাদা করেছি আমি। কিন্তু সে তো দুর্দৈব ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ তো আজীবন ভাগ্যের দাস। ভাগ্যই ওকে বিপথে ঠেলে দিয়েছিল। এখন আবার ভাগ্যই...না না, আমি জানি, একথা জানলে সুচরিতা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। কিছুতেই ক্ষমা করবে না। অভিমান তো ওরও একটা কম নেই।... প্রশান্তর মগজে দুর্ভাবনার ঘূর্ণিপাক। জলভরা চোখেই চেয়ে থাকে সুচরিতার ফটোটার দিকে। কিন্তু সুচরিতা তো ওখানে একা নেই। ওরা যে দু'জনে যুগলে রয়েছে। আজীবন যুগলেই থাকতে চায়। বলা যায় না, ছলনাময়ী কি হেতু ওদের দু'জনকে এভাবে রেখে গেছে? কিন্তু ও যাই ভাবুক, ওদের এ পরিণতি একান্ত স্বাভাবিকই ছিল। শৈশব থেকে কৈশোর এক সঙ্গে পুতুল খেলেছে—স্বপ্ন দেখেছে। সঙ্গে মা বাবা আত্মীয়-স্বজন। বয়ঃসীমায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন সকলে। কিন্তু বাদ সাধলেন বিধাতা—নির্মম বিধাতা। বিধাতার বিধানেই আজ ও অন্তর্জ্বালায় জ্বলছে। বিধাতা যদি বাদ না সাধতেন

তাহলে অনিতাকে নিয়ে দুর্ভাবনার কোন কারণই ঘটত না। বাল্য সহচরী জীবনসঙ্গিনী হয়ে পাশে দাঁড়াত।···খেদে অপমানে প্রশান্তর দু'চোখ ছেপে জল আসে। আবেগে সুচরিতার ফটোখানা চোখের সামনে তুলে ধরে। হয়তো ক্ষমাই প্রার্থনা করে। চেয়ে থাকতে থাকতে অতীতের একটি স্মরণীয় দিনের ঘটনা মনে পড়ে। বিজয়া দশমী। দর্প বিসর্জনের পর চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার মেয়েদের সিঁদুর উৎসব চলেছে। সধবা ঝি বউ কেউ বাদ নেই। গিন্নীবান্নিরাও সকলেই উপস্থিত। প্রত্যেকের হাতে রুপোর কৌটো ভর্তি টুকটুকে লাল সিঁদুর। প্রথমে সকলেই যার যার কৌটো দেবীর চরণে ছুঁইয়ে নেয়। তারপর শুরু হয় বিনিময় উৎসব। এ দিচ্ছে ওকে পরিয়ে ও দিচ্ছে ওকে। ধনী-নির্ধনী কোন বাচ-বিচার নেই। প্রত্যেকেই আজ সৌভাগ্যবতী—পতি-পুত্রবতী। সুচরিতা গেছে ওর মার সঙ্গে—প্রশান্তও তাই। দু'জনেই মায়ের আঁচল ধরা। উৎসব দেখে দু'জনেই উৎফুল্ল। মার কৌটো থেকে প্রশান্ত এক ফাঁকে একটিপ সিঁদুর তুলে সুচরিতার সিঁথিতে পরিয়ে দেয়। সুচরিতাও প্রতিদানে তাই দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মা বাধা দেন। বলেন, ও বেটাছেলে, ওকে সিঁদুর দিতে নেই, প্রণাম করো। সুচরিতা তাই করে। দুই মা দু'জনের চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু পাড়ার ঠানদি ওদের বর-বধূ বলেই সোহাগ করেন।···কোন্ সে ছেলেবেলার কথা। কিন্তু প্রশান্তর আজও আগাগোড়া মনে আছে। আজ আবার সেই কথাই স্মৃতির বেড়াজাল ভেঙে উঁকি দিচ্ছে। বুকে নবতর শিহরণ জাগে প্রশান্তর। হ্যাঁ, অতীতেই ও ফিরে যেতে যায়। অনিতা তো স্পষ্টই জানিয়ে গেল, ও বামন, আর সে আকাশের চাঁদ। বেশ, তাই হোক। আকাশের চাঁদ আকাশেই থাক। ও আর সেদিকে হাত বাড়াবে না। মাটির চন্দ্রমুখীকে নিয়েই সুখী হবে।···উচ্ছ্বাসে সুচরিতার ফটোখানা আবার বুকের সঙ্গে চেপে ধরে প্রশান্ত। দু'চোখ জলে ভরে যায়। আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে মাটির চন্দ্রমুখীর কাছে মহা

অপরাধ করেছে ও। কিন্তু চন্দ্রমুখী কি ওকে ক্ষমা করবে না? ও কি বুঝবে না, এ সবই অদৃষ্ট দেবতার পরিহাস? ভুলের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই?...বুক থেকে ফটোখানা আবার চোখের সামনে ধরে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে প্রশান্ত।

জানালায় দাঁড়িয়ে আছে সুচরিতা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়তো সুখের স্বপ্নই দেখছে। একবার ভাবে, পর্দা সরিয়ে দেখে কি করছে প্রশান্ত। কিন্তু পারে না। লজ্জা এসে বাধা দেয়। চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকে। ভজহরির পথ চেয়েই অপেক্ষা করে।

সুচরিতার ফটোখানাকে চোখের সামনে ধরে যতক্ষণ পারে অনুশোচনার জাল বোনে প্রশান্ত। কিন্তু এক সময় আবার জ্বলে ওঠে। সে জ্বালা সুচরিতার ওপর নয়। আকাশের চাঁদকে লক্ষ্য করেই। বড় দেমাক দেখিয়ে গেল ছলনাময়ী। কিন্তু না, ও আর ওর কোন স্মৃতিই রাখবে না। না না না।...

সুচরিতার ফটোখানা তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর রেখে ড্রয়ার টেনে এ্যালবামটা বার করে। এ্যালবাম ভর্তি একগাদা ফটো রয়েছে অনিতার। নানা বেশে নানা ভঙ্গীমায়। প্রশান্ত একটার পর একটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিতে থাকে। ও যেন মূর্তিমান রাহু। চাঁদের চিহ্নমাত্র রাখবে না। এ্যালবাম উজাড় হয়ে আসে। শুধু বাকি অনিতা আর ওর যুগলে তোলা বড় ফটোখানা। হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছে অনিতা ওর মুখের দিকে। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়তে পারে না প্রশান্ত। ফটোখানা চোখের সামনে ধরে করুণভাবে চেয়ে থাকে। মনে পড়ে সেদিনের কথা। চুনার গিরিদুর্গের শীর্ষে বসে জীবনের শেষ সঙ্কল্প জানিয়েই দু'জনে পাশাপাশি বসেছিল। প্রিয়তম আর প্রিয়তমা। সাক্ষী ছিল লিলি। লিলিই ওদের দু'জনকে ধরে রাখে ক্যামেরায়।...ভাবতে ভাবতে বিহ্বল হয়ে পড়ে প্রশান্ত। ছেঁড়ার আর উন্মাদনা থাকে না। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে।

পর্দার আড়ালে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল সুচরিতা। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় পর্দা খানিকটা সরে যায়। সুচরিতার চোখ পড়ে প্রশান্তর ওপর। ওর হাতে রাখা ফটোখানার ওপর। সহসা বোধহয় এক মুঠো লঙ্কার ঝাল কেউ ওর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলে। চোখ মেলে চাইতে পারে না সুচরিতা। কি দেখতে এসেছিল ও? এ কি দেখছে! মাথা ঘুরে বসে পড়ে। বসে নয় শুয়েই পড়ে। মূর্ছা যায়। ওর পুরনো রোগটা বোধহয় আবার দেখা দিল।...

বাজার থেকে ফিরে খানিক পরেই সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল ভজহরি। চোখ পড়ে সুচরিতার ওপর। চীৎকার করে ওঠে। প্রশান্ত দিশেহারার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অতর্কিতে ভূত দেখার মতোই শিউরে ওঠে। কখন এল সুচরিতা! কেনই বা মূর্ছা গেল!·· কিন্তু বেশীক্ষণ ভাববার অবকাশ নেই। সুচরিতাকে সুস্থ করে তোলাই আশু কর্তব্য। ভজহরি ছুটে গিয়ে বালতি ভর্তি ঠাণ্ডা জল আর হাত-পাখা নিয়ে আসে। প্রশান্ত নিজের কোলের ওপর ওর মাথা রেখে অবিরত জল ঢালতে থাকে। ভজহরি দেয় বাতাস। কিন্তু মূর্ছা সুচরিতার কিছুতেই ভাঙে না। অগত্যা দু'জনে ধরাধরি করে ওকে বিছানায় এনে শুইয়ে দেয়। ভজহরি যায় ডাক্তার ডাকতে। খবর পেয়ে দাদু আসেন। লিলি, অনিতা, ডক্টর দাশগুপ্ত। দাদু বোধহয় নিজেও মূর্ছা যান।

ডাক্তার এসে কঠোর মন্তব্যই করেন। 'সিরিয়াস মেণ্টাল সক্' উত্তেজিত হলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। হার্টের অবস্থাও উদ্বেগজনক।...

কাশীতে এসে দাদু শান্তি ফিরে পেয়েছিলেন। মনে মনে নহবৎ রচনার দিনই গুণছিলেন। কিন্তু সুচরিতার এ পরিণতিতে আবার ভেঙে পড়েন। চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

সবচেয়ে বেশী ভাবনায় পড়ে অনিতা। অনুমানে বোঝে, প্রশান্ত নিশ্চয় বেচারার ওপর রূঢ় ব্যবহার করেছে। হয়তো জীবন নেওয়ার

খেলাই খেলেছে। কিন্তু কেন? ওঁর কি এখনো স্বপ্ন টোটে নি? মানুষ কি এমন পাগলও হতে পারে? কিন্তু কি করতে পারে ও? সুচরিতা স্বাভাবিক অবস্থায় না এলে তো কিছু বলারও সুযোগ নেই। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সুচরিতার সেবায়ই মন দেয় অনিতা।

অনিতা যাই ভাবুক যাই করুক প্রশান্ত কি করবে ভেবে পায় না। যেদিকে ও হাত বাড়াচ্ছে সব তছনছ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুচরিতা যদি সত্যি ওর মনের কথা জানত তাহলে কি মূর্ছা যেত? সবই অদৃষ্ট। বেচারা হয়তো নাট্যের শেষ দৃশ্য দেখেই মূর্ছা গেছে। কিন্তু ওতো জানে না, আকাশের চাঁদে আর ওর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। ও চায় ওর মাটির চন্দ্রমুখীকে—আজীবনের সাথীকে। আপিস থেকে ছুটি নিয়ে প্রশান্ত সুচরিতার সেবা-শুশ্রূষায় মন দেয়। অনেক সময় অনিতার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যায় ওর। ও যে কাজ করবে ভাবে অনিতা ওর আগেই সে কাজ করে রাখে। কিন্তু কি মুশকিল, কিছু বলারও জো নেই। অনিতা তো ওর সঙ্গে কথাই বন্ধ করে দিয়েছে।

চব্বিশ ঘণ্টা পর মূর্ছা ভাঙে সুচরিতার। চোখ চাইতেই নজরে পড়ে অনিতাকে—শিয়রে বসে আছে। প্রশান্তও ওর মাথার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। দাদু বসে আছেন মাঝামাঝি একটা টুলের ওপর। অনিতার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই কেমন যেন অশান্তির ছাপ ফুটে ওঠে মুখাবয়বে। দাদুর দিকে চোখ ফিরিয়ে কাকুতি জানায়, দাদু—

দাদু বিচলিত কণ্ঠে সাড়া দেন, দিদিভাই, খুব কষ্ট হচ্ছে?

সুচরিতার উত্তর দেবার আগে অনিতা তাড়াতাড়ি এক চামচ হরলিক্স ওর মুখে দিতে যায়। কিন্তু সুচরিতা কিছুতেই হাঁ করে না। ও যেন বলতে চায়, খাবো না তোর হাতে। তুই বিশ্বাসঘাতিনী।

দাহু সেদিকে লক্ষ্য করে অনুরোধ করেন, হাঁ করো দিদিভাই! তুমি যে ভীষণ দুর্বল। এটুকু খেয়ে না নিলে কথা বলতে পারবে না, টুল থেকে ঝুঁকে পড়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন দাহু।

সুচরিতা তবু হাঁ করে না। বিরক্তির সঙ্গেই অনিচ্ছা জানায়, না আমি খাবো না। আমার খিদে পায় নি।—বলতে বলতে মাথার দিকে চোখ তুলে তাকায়। প্রশান্তকে নজরে পড়ে। চোখে ওর জ্বালা ধরে যায়। এ ও কোথায় আছে? এখানে তো ওর ঠাঁই নেই, তবে? আবার বিরক্তি ঝরে পড়ে ওর কণ্ঠে, আমি বাড়ি যাবো।

দাহু অনিতার হাত থেকে চামচেটা নিজের হাতে নিয়ে সান্ত্বনা দেন, যাবে দিদিভাই। কিন্তু তার আগে এটুকু খেয়ে না নিলে যে তুমি উঠতেই পারবে না। লক্ষ্মী দিদি আমার, হাঁ কর?—এক রকম জোর করেই হরলিক্সটুকু ওর মুখে ঢেলে দেন।

বিষ গেলার মতোই সেটুকু গিলে ফেলে সুচরিতা। ক্ষীণ কণ্ঠে আবার আবদার করে, না না, এখানে আমি থাকবো না। তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।

দাহু বুঝে উঠতে পারেন না, কেন ওর এই আত্মাভিমান। একান্ত সহানুভূতির সঙ্গেই সায় দেন, বেশ, তুমি এটুকু খেয়ে নাও, আমি গাড়ি ডাকছি।

সুচরিতা অনিচ্ছা সত্ত্বেই একের পর এক খেয়ে চলে। প্রশান্ত আর দাঁড়াতে পারে না। অধোবদনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। খানিক পরে অনিতাও।

## সতের

মূর্ছা ভাঙার পরেও আজ তিনদিন প্রশান্তর কোয়ার্টারে আছে সুচরিতা। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই আছে। ডাক্তার ওকে এখনো উঠতে বারণ করেছেন। তবে উত্তেজনা এড়িয়ে চলতে পারলে কথাবার্তা বলা যেতে পারে। দাদু আর লিলির সঙ্গেই প্রাণখুলে গল্প করে সুচরিতা। অনিতার প্রশ্নের ও হাঁ-না করে মোটামুটি উত্তর দেয়। কথা বলে না শুধু প্রশান্তর সঙ্গে। কথা বলা তো দূরের কথা ওর দিকে চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। ওর আনা বই পত্রপত্রিকা হাত দিয়ে ছোঁয়ও না। প্রতিদিনের বরাদ্দ খাবার, বিষ গেলার মতো কোনরকমে গেলে মাত্র। দাদু পুরুষমানুষ, এত সব খোঁজখবর রাখেন না। সোজাসুজি বোঝেন, লজ্জাই সুচরিতাকে ঘিরে রেখেছে। সাত পাক না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই ওরা মুখ খুলতে পারবে না। তাছাড়া উনি তো আর সব সময় কাছে থাকেন না। আহার বিহার রাত্রিবাস সবই তো এখনও চলেছে পাণ্ডাঠাকুরের ওখানে। শুধু যে ক'দিন বাড়াবাড়ি গেছে সুচরিতার সে ক'দিন ওর শিয়রে জেগে কাটিয়েছেন। দাদু ওদের ব্যাপারে অত মাথা গলান না। ভাবেন, পুরোনো রোগটাই হয়তো আর একবার শেষ কামড় দিয়ে গেল। হয়তো বাবার পুজো-আরচায় কোন অনিয়ম ঘটে থাকবে। তাই ফাঁক পেলেই উনি বাবার দোরে গিয়ে কপাল ঠোকেন। কখনো বা প্রশান্তর সঙ্গে খানিকটা বেড়িয়ে আসেন।

দাদু যাই ভাবুন অনিতা সব বুঝতে পারে। কিন্তু সুচরিতা তো এখনও তুর্বল। ওর কাছে কোন প্রশ্নই উত্থাপন করা যায় না। উত্তেজনায় আবার তুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সব বুঝেও মুখ বুজেই থাকে অনিতা। ভেবেছিল প্রশান্তর সঙ্গে আর কখনো কথা বলবে

না। কিন্তু পারে না। সুচরিতার জন্যই তা সম্ভব হয় না। সুযোগ পেলেই প্রশান্তকে অনুরোধ করে সুচরিতার জন্য। ওকে সুখী করে তুলতে। অবরুদ্ধ চোখের জলের সঙ্গেই হৃদয়াবেগ ঝরে পড়ে।...

শুধু অনিতার অনুরোধ নয় প্রশান্ত নিজে থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু সুচরিতা তো ওকে আদৌ বরদাস্ত করতে পারে না। কি করতে পারে ও? জোর করতে গেলে হয়তো মিছিমিছি উত্তেজনাই বাড়বে। হিতে হয়তো বিপরীতই হবে। প্রশান্ত ধৈর্যের পরীক্ষাই দিয়ে চলে।

আজ সাত দিন। একটু একটু করে অনেকটা শক্তি সঞ্চয় করেছে সুচরিতা। এখন উঠে সকালে বিকালে রেলিং ধরে দাঁড়ায়। ওরা কেউ বাধা না দিলে হাঁটতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে পর্যন্ত। শরীর যত সুস্থ হচ্ছে মনের রাগও তত কমে আসছে সুচরিতার। প্রশান্তর ওপর থেকে এখন আর চোখ ফিরিয়ে নেয় না। ওর প্রশ্নের মোটামুটি জবাব ও এখন দেয়। অনিতার সঙ্গে প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়েই এসে পড়েছে। রাতের সঙ্গিনী অনিতা। বেচারী, নিজের পড়ার ক্ষতি করেও ওর সঙ্গে আছে। সুখ-সুবিধার ওপর নজর রাখছে! ওর কি দোষ? জোর করে তো আর কেউ ভালবাসা কেড়ে নিতে পারে না! প্রশান্তর ইচ্ছেতেই ও ধরা দিয়েছে। হয়তো মনও দিয়েছে। তা দিক। ওরা যদি সুখী হয় তবে ওর কোন অভিযোগ নেই। ও স্বেচ্ছায়ই পথ থেকে সরে দাঁড়াবে। যা দেখেছে যা বুঝেছে তা তো আজও নিজের বুকেই চাপা রেখেছে। বাইরের লোককে জানিয়ে লাভ কি। উল্টো বোঝাই ভারী হবে। লোকে হাসবে।...ভেঙে পড়েছিল সুচরিতা, দেহের সঙ্গে মনের বল আবার ফিরে পায়। তবে এখানে আর নয়। ওদের চলার পথে ও কেন বাধা হয়ে থাকবে? দু'জনের মধ্যে এত উচ্ছলতা ছিল সবই তো ওর চোখকে ধুলো দিতে শান্ত আছে। কিন্তু না, তা কেন হবে? ও কারো অনুকম্পা চায় না। জোর করে কাকেও ধরে রাখতে চায়

না।...অনিতা ইউনিভার্সিটিতে গেছে—প্রশান্তও অফিসে। দুপুরের আহারের পর বিছানায় শুয়ে একা একা ভাবতে থাকে সুচরিতা। ভাবতে ভাবতে দু'চোখ জলে ভরে যায়। অতীত কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেলেছে ওকে নিয়ে। ও যদি এখানে না আসত। দাদু তো বলেছেন, আর দিন কতক পরে চুনার যাবেন। কিন্তু চুনারেই বা কেন? কি দরকার শরীরের? সারা জীবন তো কেঁদেই কাটাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু দাদুকে তো আর বাধা দেওয়া যাবে না। সব দিক বজাই রেখেই চলতে হবে। ওর জন্য কি না করেছেন বেচারা! বাধা দিলে মনে কষ্ট পাবেন।... সারা দুপুর বিছানায় ছটফট করতে থাকে সুচরিতা।

প্রশান্ত আজ অনেকটা দেরি করেই অফিস থেকে ফেরে। অফিসেই চা খেয়ে দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ছিল। দাদুর কাছেই শোনে, আর তিন-চার দিনের মধ্যেই ওঁরা চুনার চলে যাচ্ছেন। প্রশান্ত সাহস করে দাদুকে কিছু বলতে পারে না। শুধু সাধারণ সৌজন্য বোধে আর ক'দিন থেকে যেতে অনুরোধ করে। দাদুর তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সুচরিতাই ওঁকে অস্থির করে তুলছে। সুতরাং আর থাকা সম্ভব নয়।

সুচরিতারা চলে যাচ্ছে শুনে প্রশান্তর মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। না বলুক ভাল করে কথা, তবু তো চোখে ওকে দেখতে পারছে। ভুল বুঝেই তাহলে চলে যাচ্ছে ও। কিন্তু ওকি ওকে আর একটি বারও সুযোগ দিতে পারে না? তা না দিক। জীবনে তো সবই ও হারাতে বসেছে।...দাদুর সঙ্গে ভ্রমণ শেষ করে অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় বাসায় ফেরে প্রশান্ত। দাদু যান মন্দিরে। এসে দেখে সুচরিতা একা ঘরে আছে। অনিতা এখনও আসে নি। ও বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে একটু রাত করেই আসে। ভজহরি রান্নাঘরে খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত। হাত-মুখ ধুয়ে সোজা সুচরিতার ঘরে

এসে ঢোকে প্রশান্ত। বুকে ঝড় বইছে, তবু হাসি হাসি মুখেই প্রশ্ন করে, শুনলুম তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ?

সুচরিতা শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল। বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দেয়, হ্যাঁ।

ইস্, যাবে বই কি, আমি যেতে দিলে তো?

সুচরিতার বই পড়া বন্ধ হয়ে যায়। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। গলার স্বর গম্ভীর করেই উত্তর দেয়, তুমি আমার কে যে আটকাবে।

আমি কে তা কি তুমি জানো না?—

জানি, তবে তা নিয়ে আর তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইনে।

প্রশান্তর বুকে সহসা যেন একটা শেল এসে বেঁধে। ভাবে, এখান থেকে চলেই যায়। কিন্তু পারে না। একটু দম নিয়ে বলে, কিছু যদি বলতে চাও বলোই না।

না না, তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই।

বেশ, তা না থাক। তবে আমি বলছি, তোমার যাওয়া এখন হবে না।

আলবাৎ হবে।

আমি না দিলেও?

তুমি না দিলে নয়। আমি জানি, আমি এখান থেকে গেলে তুমি খুশীই হবে। বই থেকে মাথা তুলে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সুচরিতা।

প্রশান্তও ঝঙ্কার দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু কি যেন ভেবে নিরস্ত থাকে। একান্ত করুণভাবেই বলে, তুমি যা জানো তা ভুল।

ভুল! আমি কি জানি না, তোমার উনি কেন মুখ ভার করে থাকেন।

কার কথা বলছ তুমি?

কার কথা বলছি তা তুমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছ।

স্পষ্ট করে জবাব দাও সুচরিতা।

স্পষ্ট করেই বলছি, তোমার সাধের অনিতা দেবী! ওর মুখে এত হা-হুতাশ কেন?

উনি তোমার দিদি। আশা করি ওঁর মর্যাদা রেখেই কথা বলবে।

খুব যে লাগল। মর্যাদা—তুমি আর আমাকে মর্যাদার কথা শেখাতে এসো না।—রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে সুচরিতা।

প্রশান্ত নিরুপায়। ওর ভয় হয় সুচরিতা আবার না মূর্ছা যায়। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ও। যেতে যেতে বলে, তুমি এখন উত্তেজিত। তোমার সঙ্গে কোন কথা হতে পারে না।

প্রশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও সুচরিতা আর পড়ায় মন দিতে পারে না। এ ও কি করল। প্রশান্তকে এমন করেও বলতে পারল! ও না খানিক আগেই ভেবেছিল, কারও বিরুদ্ধে ওর কোন অভিযোগ নেই—নিঃশব্দে এখান থেকে চলে যাবে। তবে ও এমন রূঢ় হতে পারল কি করে?…বালিশে মাথা গুঁজে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে সুচরিতা। সে রাত্রে আর কিছুই খেতে পারে না! প্রশান্তও না। কিন্তু অনিতা শুতে এসে কিছুই টের পায় না। বড় ক্লান্ত ও, শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে। ভজহরিও তাই। ঘুম নেই শুধু সুচরিতা আর প্রশান্তর চোখে। আপন বলতে সংসারে আজ আর প্রশান্তর কেউ নেই।

কার্তিক মাসের শেষ প্রহর। কাশীতে শীত পড়তে শুরু হয়েছে। বেশ হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু প্রশান্তর গায়ের জ্বালা তাতেও জুড়োয় না। বাইরের রেলিংএ এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। পথ-ঘাট নিঃশব্দ। ও যেন ওর আপন আত্মার কাকুতিই শুনতে পাচ্ছে। বড় করুণ বড় মর্মভেদী। রেলিং থেকে ঘরে আসে আবার। অনেকদিন পর আজ বেহালাটা নিয়ে বসে। একটানা বাজিয়ে যায়। রাত্রির নিস্তব্ধতায় সারা বাড়িময় অনুরণিত হতে থাকে সুরের মূর্ছনা। প্রশান্তর বিরহী আত্মা যেন গলে গলে পড়ছে

সুরের সঙ্গে। সুচরিতা স্থির থাকতে পারে না। ওর মনের গহনে ঝড় ওঠে। ও শুধু কেঁদে ভাসায় নাক মুখ চোখ। বালিশ ভিজে যায়।

পরের দিনের আবহাওয়া আরও গম্ভীর। আজ আর প্রশান্ত একবারও এসে সুচরিতার শয্যার পাশে দাঁড়ায় নি। সারা দিনে খোঁজও নেয় নি একবার। বড় অপমানিত বোধ করে সুচরিতা। দাত্নকে বলে আজই ও টিকিট কাটাবে। সম্ভব হলে কালই চলে যাবে এখান থেকে।

প্রশান্তও কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে। অফিসের কোন কাজই করতে পারে না। অকারণ বিরক্তি প্রকাশ করে অধীনস্থদের ওপর। একজনের সামান্য ত্রুটিতে চাকরির খাতায় কঠোর মন্তব্য লিখে দেয়। হয়তো সারা জীবন ভুগতে হবে বেচারাকে। এত কর্কশ তো এর আগে ও ছিল না। কিন্তু কি করতে পারে ও? আসলে হৃদয়খানাই যে হারিয়ে বসে আছে। আজ রাত্রেও ঘুমোতে পারে না। ড্রয়ার খুলে অনিতার ফটোটা বার করে। যে ফটো দেখে ভেঙে পড়েছে সুচরিতা। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। দাঁত বার করে কেমন হাসছে ছলনাময়ী। না না, ওর অত গর্ব ও সহ্য করবে না। চাঁদ মুখে কলঙ্ক লেপে দেবে। গাঢ় কলঙ্ক।···উত্তেজনায় দোয়াত থেকে কলমের ডগায় কালি নিয়ে সারা মুখখানায় মাখিয়ে দেয়। সুন্দর মুখ মুহূর্তে বীভৎস হয়ে ওঠে। প্রশান্ত খিলখিল করে হাসতে থাকে। তারপর হাসি থামলে দেখা যায় অশ্রু ঝরছে তু'চোখের কোণ দিয়ে। টেবিলে মুখ গুঁজে খানিক পড়ে থাকে। মনের কোণে ভেসে ওঠে সুচরিতার মুখ। হাতের কাছেই রয়েছে ওর-ও ফটোগ্রাফ। শুধু ওর একার নয়। ওদের তু'জনের—যুগলে। দেবে কি ওর মুখেও কলঙ্ক এঁকে? না না, ও তা পারবে না। না-না-না।

বাইরের রেলিং ধরে আজও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে প্রশান্ত।

আর কাঁদতে পারে না। মনকে শক্ত করে বাঁধতে চেষ্টা করে। এই তো বেশ ভাল ব্যবস্থা। সুচরিতা চলে যাক। ও-ও চলে যাবে। সংসার ছেড়ে—সকলকে ছেড়ে। দু'মাস কাটাবে যাযাবরের জীবন। তারপর তো সাগর পারে। আর আসবে না। কোনদিন না। মা-মণির খুবই কষ্ট হবে। তা হোক। ওরই কি কম কষ্ট হচ্ছে?...

অনেকক্ষণ পরে ঘরে ফিরে আসে প্রশান্ত। আজও আবার বেহালা বাজাতে শুরু করে। করুণ—হৃদয়বিদারী সুর। সুচরিতা বোধহয় পাগল হয়ে যায়।

## আঠার

দু'দিন পরে। প্রশান্ত আবার মুখ খুলেছে। তবে আগের মতো প্রাণপ্রাচুর্য আর নেই। ওর বাসায় আছে সুচরিতা তাই কোন রকমে সৌজন্য রক্ষা।

প্রশান্তর পরিবর্তনে সুচরিতার কেন যেন ভয় করে। ভাবে, ক্ষমা চেয়ে নেয়। রিজার্ভেশন পাওয়া গেছে। কাল বাদে পরশুই তো চলে যাচ্ছে ওরা। তবে আর ঝগড়া রেখে যাওয়া কেন? একবার চলে গেলে আর তো জীবনে দেখা হবে না। যা খুশি ঘটুক। কিন্তু কিছুতেই সক্রিয় হতে পারে না। আত্মসম্মানে ঘা লাগে।

দুপুরের আহারের পর বই নিয়ে বসে কিন্তু কিছুতেই পাঠে মন বসে না। বিছানায় বসে একাকী আকাশ-কুসুম ভাবতে থাকে সুচরিতা। প্রশান্ত অফিসে গেছে। অনিতা ইউনিভার্সিটিতে। কারও সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা ইচ্ছে করলে ঝগড়া করার পর্যন্ত উপায় নেই। সুচরিতা বড় অস্বস্তি বোধ করে। উঠে ভজহরিকেই ডাকতে যাচ্ছিল কিন্তু ভজহরি অযাচিতভাবে এসে সেই মুহূর্তেই হাজির হয়।

সুচরিতা অনেকটা হালকা বোধ করে। একটা চেয়ার দেখিয়ে মোলায়েম করেই ওকে বসতে বলে।

সমাদরে খুশী হয় ভজহরি। কিন্তু চেয়ারে বসে না। কোঁচার খুঁট দিয়ে ঝেড়ে মেঝের ওপরেই বসে। বড় উদ্বিগ্ন দেখায় ওকে।

সুচরিতা সেদিকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে, কিছু বলবে ভজদা?

হ্যাঁ দিদিমণি, তোমাকে একটা কথা বলব বলেই এলাম। শুনলাম, তোমরা নাকি পরশুই এখান থেকে চলে যাচ্ছ? আমাকে তোমাদের সঙ্গে নেবে?

সেকি! তুমি যাবে কি করে?

না গিয়ে কি করব বলো? দাদাবাবু আমাকে জবাব দিয়েছেন। তোমরা চলে যাবার পরের দিনই উনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন।

চলে যাচ্ছেন! কোথায়?

তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে! শুনেছি, দু'মাস পরে বিলাত যাচ্ছেন। মাঝখানের এই সময়টা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবেন।

ভজহরির কথা শুনে সুচরিতার গলা শুকিয়ে যায়। আর একটা কথাও বলতে পারে না।

ভজহরি ঢোক গিলে আবার আরম্ভ করে, কত করে বললাম, দাদাবাবু, যে কটা দিন এ দেশে আছ আমাকে সঙ্গে নাও। কিন্তু সে কথা কি কানে তুলল? আমার হাতে এক গাদা টাকা দিয়ে উত্তর দিল, ভজদা, দেশে চলে যাও। আমার সঙ্গে কোথায় ঘুরে মরবে? তাই বলছিলাম—

কিন্তু তুমি সঙ্গে না থাকলে যে খুব কষ্ট হবে ওঁর, সুচরিতা মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয়।

তা কি আমি জানি না দিদিমণি! কিন্তু কি করব? কাল সকালে সঙ্গে করে একজন দোকানীকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। ঘরের সমস্ত জিনিস বেচে দেবে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা

দেখতে পারব না। আমি তোমাদের সঙ্গেই যাব,—বলতে বলতে কোঁচার খুঁটে চোখ মোছে ভজহরি।

সুচরিতার চোখের কোণও ভিজে ওঠে।

ধরা গলায় ভজহরি আবার বলে, ভেবেছিলাম, অনিতা দিদিমণিকে বলি! উনি বললে যদি কোন কাজ হয়। কিন্তু ওঁর তো আজকাল পাত্তাই পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় ওঁর সঙ্গেও দাদাবাবুর একটা কিছু হয়েছে। তা তুমি একবার বলবে দিদিমণি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুচরিতা উত্তর করে, আমি বললে কি কোন কাজ হবে?

নিশ্চয় হবে। আমি জানি, তুমি বললে তোমার কথা উনি না রেখে পারবে না।

আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয় দিদিমণি। তোমার দুটি হাতে ধরছি, তুমি একবারটি বলো।

বেশ বলব। কিন্তু তুমি উঠলে কেন?

আমাকে যে এক্ষুনি একবার ধোপাখানায় যেতে হবে। হুকুম হয়েছে, ঘরের সমস্ত ময়লা জামা-কাপড় আজই জরুরী কাচতে দিতে হবে। এরপর আর সময় কখন পাব বল? তুমি কথাটা যেন বলো দিদিমণি। কোলকাতায় কর্তাবাবুকেও আমি চিঠি দিয়েছি।··· ভজহরি বেরিয়ে যায়।

সুচরিতা মহা ভাবনায় পড়ে। কি করবে ও এখন? প্রশান্ত কি ওর ওপরেই প্রতিশোধ নিচ্ছে?···ভাবতে ভাবতে নিজেও ঘরের বাইরে আসে। ভজহরি এইমাত্র ময়লা জামা-কাপড় নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাসায় ও একা। প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনো প্রশান্তর ঘরমুখো হবে না। কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা নিজেই ও ভাঙতে চলে। আজ কেন যেন প্রশান্তর ঘরই ওকে টানছে। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা প্রশান্তর ঘরের দিকে পা বাড়ায়। দরজার কাছে

এসে খানিক ইতস্তত করে। কিন্তু সে নামমাত্র। আজ আর ওর কোন ভয়ডর নেই। দরজা খুলে সোজাসুজি ঘরের ভেতরেই ঢুকে পড়ে। একি হাল হয়েছে ঘরের! একটা জিনিসও যে সাজানো গুছানো নেই! তাড়াতাড়ি বেহাল্যাটার গায়ে ঢাকনা পরাতে যায়। খোলা অবস্থায় বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে। টেবিলটার কাছে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। এটা যে ওরই ফটো। ওর একার নয়—ওদের দুজনের। তাহলে সেদিন কি দেখল ও! উৎকণ্ঠায় তাড়াতাড়ি ড্রয়ার টানে। এ্যালবামটা উপরেই রয়েছে। একটার পর একটা পাতা উল্‌টিয়ে যায়। কই আর একটাও তো ফটো নেই! না না, এই তো রয়েছে। ছি ছি ছি, অনিদির এ দশা কে করল! সারা মুখখানায় যে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে!...হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না সুচরিতা। বুঝিবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে আসে। নিজের ঘরে খিল দিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

প্রশান্ত আজ অনেকটা বেলা থাকতেই অফিস থেকে ফেরে। সুচরিতার জন্য একগাদা গরম জামা-কাপড় কিনে নিয়ে এসেছে। মনে যাই থাক, আজ আর ওর কোন কিছুতেই রাগ নেই। সুচরিতাকে ও হাসি মুখেই বিদায় দেবে। দুনিয়ার সঙ্গে সব ঝামেলাই যখন চুকিয়ে দিয়েছে তখন আর ভাবনার কি!...অফিস থেকে ফিরে সরাসরি সুচরিতার ঘরেই ঢোকে। সুচরিতা একাই আছে। বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে। খানিক আগেই আকুল হয়ে কেঁদেছে। চোখের জল অবশ্য শুকিয়েছে কিন্তু তার দাগ এখনও মেলায় নি।

ঘরে ঢুকে হালকা সুরেই সম্বোধন করতে যাচ্ছিল প্রশান্ত, কিন্তু পারে না। ওর মুখখানা যে থমথম করছে। জামা-কাপড়ের বাক্সগুলো এগিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবেই বলে, এগুলো নিয়ে এলাম। দেখ তোমার পছন্দ কিনা এবং মাপ ঠিক আছে কিনা?

সুচরিতা বাক্সগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় না। একান্ত উদাসীন থেকেই উত্তর করে, জামা-কাপড়ের আমার কোন দরকার নেই।

দরকার নেই মানে! চুনার যাচ্ছ, শীত পড়তে শুরু হয়েছে, অসুস্থ শরীরে অসুবিধা হবে না?

আমার কোন অসুবিধা হবে না।

অবশ্যই হবে। শীতের দিনে প্রত্যেকের গরম জামা-কাপড় দরকার হয়।

বলছি তো, আমার যা আছে তাতেই চলবে।

তাতে চলবে না বলেই এগুলো কেনা হয়েছে। তাছাড়া এতে সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। টাকা দাদুই দিয়েছেন। আমি শুধু বহন করে এনেছি।

সুচরিতা একথার কোন জবাব দেয় না। এক ঝলক তির্যগ দৃষ্টি হানে মাত্র।

অনুরোধের জবাব এভাবে ফিরে পাওয়ায় অপমান বোধ করে প্রশান্ত। গম্ভীর মুখ লাল হয়ে ওঠে। ঝাঁঝের সঙ্গেই আগের কথার জের টানে, আমি বহন করে আনায় যদি দোষ হয়ে থাকে তাহলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিয়ো। শুনেছি, কাশীর গঙ্গা সর্ব কলুষহারিণী,··· বলতে বলতে জামা-কাপড়ের বাক্সগুলো টিপয়ের ওপর রেখে বেগের সঙ্গে বেরিয়ে যায় প্রশান্ত।

সুচরিতা অস্ফুট গুঞ্জরন করে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে,—

প্রশান্ত ভেবেছিল সুচরিতার ঘরে বসেই আজ চা জলখাবার খাবে। কিন্তু বরাতে ওর অত সুখ নেই। তাই অপমানিত হয়ে অফিসের জামা-কাপড়েই আবার বেরিয়ে পড়ে। মাথায় যেন আগুনের হল্কা ছুটছে। এলোমেলো খানিকটা ঘুরে অবশেষে এসে বসে দশাশ্বমেধ ঘাটের এক পাশে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ঘাটে তাই তেমন ভিড় নেই। বেশ ভালই লাগে প্রশান্তর। দূরে

কে এক ভক্তিমতী উদাত্ত সুরে ভজন গাইছেন। মন প্রাণ জুড়োয় ওর। কিন্তু রাত কম হলো না। অনিচ্ছা থাকলেও বাড়ি না ফিরে উপায় নেই। সুচরিতা যেমন খুশি ব্যবহার করুক। কিন্তু ওর উচিত হাসিমুখে না হলেও অন্তত সৌজন্য রেখে ওকে বিদায় দেওয়া। যে রকম অভিমানিনী হয়তো না খেয়েই বসে আছে।... প্রশান্ত আর দেরি করে না। ন'টার কাছাকাছি উঠে পড়ে। পথ চলতে চলতে মনে হয়, হায় রে পোড়া কপাল, "যার জন্যে চুরি করলুম সেই বলে চোর।" না না, আর সুখের স্বপ্ন কেন? ওরা তো পরশুই চলে যাচ্ছে! তারপরেই ওর মুক্তি। জ্বালা পোড়ার শেষ।...

যা ভেবেছিল প্রশান্ত ঠিক তাই হয়েছে। সুচরিতা না খেয়ে গোঁজ হয়ে বসে আছে। ভজহরি কিছুতেই ওকে খাওয়াতে পারে নি। ভাগ্যিস অনিতা এখনো পৌঁছোয় নি। অনর্থক কেলেঙ্কারী বাড়ত শুধু। প্রশান্ত তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে। সুচরিতাও আর আপত্তি করে না।...

পরের দিনের গভীর রাত্রি। প্রশান্তর চোখে ঘুম নেই। রাত পোহালেই সুচরিতা চলে যাচ্ছে। জীবনে আর হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হবে না। প্রশান্ত টেবিল-ফ্রেমে আঁটা পাশাপাশি ওর আর সুচরিতার ফটো আলাদা করে ফেলে। সুচরিতার একার ফটো-খানাই মাত্র ফ্রেমের মধ্যে রাখে। বিদায় বেলায় নিজের হাতে ও ফিরিয়ে দেবে এ ফটো সুচরিতাকে। কি হবে ফটো দিয়ে আসল মানুষই যখন চলে যাচ্ছে? ফটোখানা আলাদা করতে গিয়ে দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে থাকে প্রশান্তর। হাত কাঁপে। মনে হয়, আর একবার চেষ্টা করে দেখে। যদি নিজের মুখে সব খুলে বলে ও? না, তা আর হয় না। সুচরিতা পাষাণেই বুক বেঁধেছে। ওকে বোঝানো যাবে না। হয়তো অনর্থই বাড়বে শুধু।...প্রশান্ত এগুতে গিয়েও এগুতে পারে না।

রাত্রি আরও গভীর। কি করে প্রশান্ত? চেষ্টা করেও যদি একদণ্ড ঘুমোতে পারে! থাক, না এল ঘুম। সময় কাটাবার তো আরও একটা উপায় আছে। নিরুপায় প্রশান্ত বেহালা খুলেই বসে। আজকের সুর আরও করুণ আরও মর্মভেদী।

ঘুম সুচরিতারও আসে নি। ওর মনেও সহস্র প্রশ্ন। ওকি প্রশান্তর ওপর অবিচার করছে? বেচারা, কত আশা নিয়ে সেদিন ঘরে এসেছিল। কিন্তু কি পেলো ও? সংবর্ধনার বদলে শুধু ভর্ৎসনা অপমান অবহেলা।...সুচরিতার দম বন্ধ হয়ে আসে। সহসা ছেলে-বেলার কথাই মনের কোণে উঁকি দেয়। সেই বিজয়া দশমীর দিনের কথা সেই সিঁদুর খেলা। মনে হয়, প্রশান্ত ওর স্বামী ছাড়া আর কেউ নয়। ভুল করলে ওঁকে ওর শোধরানোই উচিত—দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। বেহালার সুর-ঝংকারে সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে সুচরিতার। না, আর অভিমান নয়। আজ রাত্রে না হলে আর ও প্রশান্তকে নাগালের মধ্যে পাবে না। চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। পা টিপে টিপে এসে প্রশান্তর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু থামলে তো ওর চলবে না। সময় যে আর নেই।...সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়ে সুচরিতা।

প্রশান্ত তন্ময় হয়ে ছড়ি টানছে। বাহ্যিক কোন রকম ভ্রূক্ষেপ নেই। সুচরিতা ছুটে এসে ওর পা জড়িয়ে ধরে।

ঘর অন্ধকার। অতর্কিতে বাজনা থেমে যায় প্রশান্তর। সবিনয়ে প্রশ্ন করে, কে?

সুচরিতা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে কান্নার সুরে আবদার করে, আমি যাব না।

বেহালা নামিয়ে রেখে প্রশান্ত দু'হাতে ওকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। হাসি হাসি মুখেই বাধা দেয়, আমি যেতে দিলে তো।

সুচরিতার পিছু পিছু অনিতাও বিছানা ছেড়ে উঠে আসে।

সঙ্গে সঙ্গেই উঠে আসে। উচ্ছ্বসিত সুচরিতা টেরও পায় না। বেহালার সুরে ওর ঘুম ভেঙে গেছে।

সুচরিতা ঘরে ঢোকে, অনিতা চুপি চুপি এসে বাইরের জানালা ধরে দাঁড়ায়। অন্ধকার ঘরেও ওদের যুগলরূপ স্পষ্ট নজরে পড়ে ওর। সংকল্প ওর আজ পুরোপুরি সিদ্ধ। ওকি শাঁক বাজাবে না উলু দেবে? অনিতা আর দাঁড়াতে পারে না। ছুটে নিজের ঘরে পালিয়ে আসে। চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। বুকখানা আজ ওর সত্যি খালি হয়ে গেল।